অঞ্জলি
১৪২৭
Anjali 2020
Durga Puja Magazine
Greater Binghamton Bengali Association

সম্পাদকীয়

প্রদীপ্তা চ্যাটার্জি

প্রতিবারের মতো এবারেও আমাদের শারদ সাহিত্য নিবেদন অঞ্জলিকে আপনাদের কাছে নিয়ে আসতে পেরেছি, আশা করি আপনাদের ভাল লাগবে ।

দুর্গাপূজা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা সকল বাঙালির চিরকালীন আনন্দোৎসব । ।কোলকাতা ও বাংলার মানুষগুলির কাছে পূজোর কয়েকটা দিন অতি প্রিয় । রোজকার দৈনন্দিন গতানুগতিক জীবনটা সম্পূর্ণ বদলে যায় এই সময়ে । পুরনো এই কোলকাতা শহর হয়ে ওঠে মোহময় ও রঙিন ।সংস্কৃতি এবং ধর্মের এই অভিনব সমন্বয় আর কোনও অনুষ্ঠানে দেখা যায়না ।

তবে আমাদের সকলের জীবনই গত কয়েক মাসে ভীষণ ভাবে বদলে গেছে ।আমরা একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে খানিকটা দিশাহারা ভাবে দিনগুলি কাটিয়ে চলেছি । সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এক অপরিচিত ভাইরাসের সংক্রমণ, একে চোখে দেখা যায়না তবে অদৃশ্য থেকে কাকে যে কখন আক্রমণ করবে তা আমরা কেউ জানিনা ।বিশ্বাস করতে মন চায়না যে আজকের উন্নত পৃথিবী একটি ভাইরাস কে পরাস্ত করবার প্রতিষেধক এখনও প্রস্তুত করে উঠতে পারেনি ।

মা দুর্গার আগমন আমাদের মনে যোগায় আশা ও ভরসা, বাড়ায় আমাদের মনোবল, এখনকার সময়ে যা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন । তাই আজ সারা বিশ্বের মানুষের শুভকামনার আশায় আসুন আমরা প্রার্থনা করি মায়ের কাছে ।

আমাদের গ্রেটার বিংহাম্পটন বেংগলী এ্যাসোসিয়েশনের ১৪২৭ সালের দুর্গোৎসব এবারে হবে ভার্চুয়াল, সকলের সুরক্ষার জন্য ।আমরা নিষ্ঠা ও ভালবাসার সঙ্গে মায়ের আরাধনা সম্পন্ন করবো ।

বাঙালির দুর্গাপূজা শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়। দেশে ও বিদেশে সকল দুর্গাপূজার মধ্যে দিয়ে বাঙালি চিরদিনই প্রকাশ করে চলেছে তার ধর্ম, সংস্কৃতি, ও সামাজিকতা । দুর্গাপূজার উদযাপনে দেখা যায় বাঙালির শিল্প, সংস্কৃতি এবং সৌন্দর্য বোধের অনন্য এবং সৃষ্টিশীল সমন্বয় । শারদ সাহিত্য চিরদিনই দুর্গাপূজার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে থেকেছে। এই ঐতিহ্য বজায় রেখে, আমরাও প্রতি বছরেই আপনাদের জন্য নিয়ে আসি অঞ্জলি; মায়ের পূজায় আমাদের সাহিত্য নিবেদন ।

সাহিত্য সমাজের প্রতিফলন, তবে সাহিত্য শুধু মানুষকে তার পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে অবহিত করেই থেমে থাকেনা, সাহিত্যের দায় অনেক বেশী । সাহিত্য সমাজকে পথ দেখাতে সাহায্য করে, মন্দ থেকে ভালোতে, অন্যায় থেকে ন্যায়ের পথে মানুষকে পথ দেখাতে সাহায্য করার প্রচেষ্টায় থাকে । সাহিত্যের দায় দায়িত্ব তাই অনেক। আবার সাহিত্যের মাধ্যমে লেখকের সঙ্গে পাঠকের ঘনিষ্ঠভাবে মানসিক যোগাযোগ ঘটে , সাহিত্যের এটি অমূল্য অবদান । অঞ্জলি আমাদের অতি ক্ষুদ্র ও বিনীত আয়োজন এইসব দায়িত্বপালনের প্রয়াসে এবং আপনাদের ভাল লাগার আশায় ।

আপনারা যাঁরা সাহিত্য ও শৈল্পিক অবদানের দ্বারা অঞ্জলি ১৪২৭ কে সম্ভব করেছেন তাঁদের জন্য অঞ্জলির পক্ষ থেকে অনেক অভিনন্দন রইল ।সময় এবং লোকবলের অভাবে তৈরি অঞ্জলি ১৪২৭ তে অনেক ভুল থেকে যাওয়া সম্ভব, আশাকরি আপনারা এইসব অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনা করে নেবেন ।

আমরা সম্প্রতি জানতে পেরেছি একটি নিদারুণ দুঃখের সংবাদ । শ্রী অমল কৃষ্ণ ব্যানার্জি, আমাদের সাগ্রীজি গত পয়লা অক্টোবর, ২০২০ তে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন । এই খবরে আমরা সবাই মর্মাহত ।এই দুঃখ প্রকাশের ভাষা জানা নেই ।

আপনাদের সবাইকার জন্য রইল অনেক প্রীতি, শুভেচ্ছা, ও শুভকামনা ।

প্রদীপ্তা চ্যাটার্জি

সূচীপত্র

দীপা দাশগুপ্তা ~প্রচ্ছদ ও শেষের পাতার অঙ্কন

(Front and Back Covers)

সম্পাদকীয়~ প্রদীপ্তা চ্যাটার্জি

In Memorium-Greater Binghamton Bengali Community-1

ART

Abhishek Datta–96

Swapnila Das–97

Dipa Dasgupta-98-99

Amrita Banerjee-100

Pradipta Chatterji-101

কবিতা

ধূমকেতু- NEOWISE- সম্বিত সাহা–2

চিরায়ত, ও পয়স্বিনী- অঞ্জলি দাশ–3–4

শব্দ সন্ধান- স্বর্ভানু সান্যাল–5

বৃষ্টি এলে, কিছু কথা, শূন্যতা ও বীজ- সুদীপ্ত বিশ্বাস–6–7

জীবন যেমন, ও খোঁজা- নুপুর রায়চৌধুরী–8

দুঃস্বপ্ন, জন্ম ও মৃত্যু- স্বরূপ মণ্ডল–9–10

বেসুরো গান- কুমকুম করিম–11

অরূপ অন্ধকার- দেবাশিস গোস্বামী–12

জামাই-কা ফেয়ারওয়েল- দত্তাত্রেয় দত্ত–13

কুফরি- নীলাদ্রি সরকার–14

English Section

My Oracle- Asish Mukherjee-102

Pathivrathaa- Sushma Vijayakrishna-103-106

Nagarhole National Park- Archana Susarla-107-108

Silver Lining in Pandemic:

A Photo Diary- Vaswati Biswas-109-111

Sweet Revolution-Sambit Saha-112

Children's Corner

Sophie The Puppy-Story & Drawing-Amritakshi Sanyal-15-17

Drawing-Alice Bhawal-18

The Peacock-poem & Drawing- Ella Bagchi-19

Drawing-Meenakshi Chakravadnu-20

Airbus Vs. Boeing: A History of Market Rivalry- Sriram Chakravadhanula-21-24

Vicious Virus-poem & Drawing-Sureeta Das-25-27

Drawing--_Hridayanshu Das-28

Photos & Artwork- Arpan Dasgupta-29-30

গল্প, রম্য রচনা ও ভ্রমন

টক ঝাল মিষ্টি- অনসূয়া দত্ত-31-34

অনন্ত= হীরক সেনগুপ্ত-35-42

ধ্বংসের খেলা-অনন্যা দাশ-43-46

যুদ্ধের সেকাল একাল-অর্ণব দাশগুপ্ত-47-50

মহালয়া=মৌবনী দাস-51-52

ধ্বনি-সায়ক সেনগুপ্ত-53-54

বেলুন নেবে গো-সৌমি জানা-55-56

জল=দেবাশিস দাস-57-59

রুপুর পাখি-পায়েল চ্যাটার্জি-60-62

ফেরা-সুদীপ সরকার-63-67

চৈতালি সরকার-কামড়-68-71

প্যারাসাইট-দেবতোষ ভট্টাচার্য-72-76

স্মৃতির পূজো - পূজোর স্মৃতি - ঝর্না বিশ্বাস-77-80

একটু ভেবে দেখুন- পরেশ নাথ রায়-81-84

ভাড়াবাড়ির কথা-দেবায়ন চৌধুরী-85-87

গৌতম সরকার-“লংকার-তরকারি”-88-89

দিউ সুন্দরী-সুবীর বোস-90-92

ভূত -সুশোভিতা মুখার্জী-93-95

In Memorium

Greater Binghamton Bengali Association

Shri Amal Krishna Banerjee (Shastri-Ji, to our community) left our mortal world for his heavenly abode on October 1, 2020, finally succumbing to cancer after a brave and dignified battle with this illness for 3 years, never ever losing his positivity of spirit and energy in this fight. He was born on February 16, 1941 in a Bengali-Hindu family, in pre-Independence Calcutta. After growing up till his teenage years in a home with his loving parents, two brothers and a sister, he left for Bombay at the age of 16 to find a job. He spent the next 19 years in that city before receiving a telegram from his father one day that he had to come home because his marriage had been “fixed” to a beautiful Bengali girl, Amiya (Mashima, to our community). Shastri-Ji and Mashima got married without ever meeting once, as was a common custom in those days and in due course had three children, Jana, Chandana and Aniruddha whom most people in our Greater Binghamton community know.

Soon after marriage, Shastri-Ji received a job posting in Sarabhai Chemicals in Baroda, Gujarat. He obtained a Masters degree in Astrology from Maharaja Sayajirao University and embarked on a career as a priest and astrologer while continuing to work in his other job. He travelled to many states in India in the next few decades performing religious rituals and sharing his knowledge of astrology and Hindu scriptures. He eventually moved to the United States in 2005 to serve as a priest in a temple in Somerset, NJ. After a few years in Somerset, he relocated to Long Island, NY where he found employment as a priest in the Long Island Kali Temple and finally to Queens, NYC. He retired from the Queens, NYC Temple in 2016 to live in Greater Binghamton and be close to his son, Aniruddha, daughter-in-law Abha and grandchildren, Aditya and Ananta. He and Mashima moved with Aniruddha to California in February 2020 after their son relocated to that state.

Shastri-Ji has had a long association with the Bengali community in Greater Binghamton. He served as the priest in every Greater Binghamton Durga Puja from the year 2008 when the community organized their first community Durga Puja, till the community Durga Puja of 2019.

He will be greatly missed by everybody that knew him. He was a wonderful and dedicated husband, father, father-in-law and grandparent. Our community in Greater Binghamton will fondly remember him as a warm, kind-hearted and cheerful friend, neighbor and elder that could always be counted on to perform our community pujas, Hathe Khori during Saraswati Pujas and Annaprashans (first rice eating ceremonies for infants).

May his atman find shanti in the divine presence of our Supreme Creator!

ধূমকেতু NEOWISE

সম্বিত সাহা

শ্রাবণ আকাশের অসীম প্রসারে
কোটি কোটি তারার প্রতিফলনে
তোমার আকার এল নয়নে
পরাবৃত্ত পথে তুমি দ্রুতগামী
কক্ষপথে লিখে তোমার কাহিনী
কোথায় শুরু বা শেষ, আমি না জানি!
শতকোটি নক্ষত্র বুনেছে মায়াজাল
যে সূর্যের রশ্মি তোমায় করে উজ্জ্বল
তাঁরি তাপ তোমার শরীরে ধরায় ফাটল
ভুল করো না বন্ধু হয়ে সূর্যমুখী
তোমায় বাঁচতে হবে যতদিন বাঁচে পৃথিবী
ভূডাকঘর থেকে বিশ্বে বিলি কোরো মোদের জীবন চিঠি

যদি আবার ফিরে আসো, সাত হাজার বছর পরে
আমার দেহের বালুকণা খুঁজে নিয়ো এই ভবসাগরে
কোনো নদীর গভীরে, সমুদ্র পাড়ে
কোনো পাহাড়ের চূরে, মেঘের আড়ালে
এক ভবঘুরে আত্মাকে নিয়ে যেও দিয়ে হাতছানি
বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণে, দেখাতে বিধাতার সৃষ্টিখানি ।

সম্বিত সাহা আর তাঁর স্ত্রী অঞ্জু , নিউইয়র্কের ভেষ্টালে থাকেন। সম্বিতের প্রিয় বিষয় বিজ্ঞান , ইতিহাস আর সাহিত্য। ব্লগিং এবং স্বেচ্ছাসেবীর কাজ (শিক্ষা, পরিবেশ ও জীবিকার প্রকল্প) ও সম্বিত খুব উপভোগ করেন। তিনি Lehigh University থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডক্টরাল ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং একটি মহাকাশ সংস্থায় চাকরি করেন।

চিরায়ত

অঞ্জলি দাশ

নষ্ট বলে আসলে কিছুই নেই।
যেন এক সমাপন থেকে অন্য আরম্ভের দিকে
যেতে যেতে আনমনে ছড়িয়ে পড়েছে কিছু।

পড়ে আছে, পড়ে আছে কত কাল,
না দেখা বীজের মত, না বোঝা স্বপ্নের মতো,
অশ্রুত স্বরের মতো.
বন্ধ দরজার সামনে পড়ে থাকা খুব তুচ্ছ অপেক্ষার মতো।

অনুচ্চার যে স্বরবর্ণ ততটা স্পষ্ট নয়,
শুধু ছুঁয়ে থাকে ব্যথার মতন,
তাকে ভেবে জলের শব্দ দিয়ে যে অক্ষর লেখা হলো,
সে-ই যেন কবিতার মুখ জীবনের দিকে ফেরালো আবার।

অঞ্জলি দাশ

মনোবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর। কিশোর বয়স থেকে সাহিত্যচর্চার শুরু কবিতা দিয়ে হলেও পরবর্তীতে কবিতার পাশাপাশি সমান দক্ষতায় গল্প এবং উপন্যাস রচনা শুরু করেন । দেশ, আনন্দবাজার, সানন্দা ও আরো অনেক প্রতিষ্ঠিত পত্রিকায় তার গল্প প্রকাশিত ও বিশেষভাবে প্রশংসিত ।এ ছাড়া বিভিন্ন ওয়েব ম্যাগাজিনে নিয়মিত লেখেন। ‘জেব্রাক্রসিং’ নামে একটি সাহিত্যপত্রিকা সম্পাদনা করেছেন (১৯৭৮ -১৯৮১ পর্যন্ত)। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থঃ পরীর জীবন(১৯৯১), চিরহরিতের বিষ (১৯৯৯), এই মাস নিশ্চুপ তাঁতের (২০০১) , সহজে বোঝো না (২০০৯), শ্রেষ্ঠ কবিতা (২০০৯)মুগ্ধ হয়ে থাকি (২০১৭),হৃদয়ের বোন প্রকাশিত গল্প সংকলনঃ এক প্রজাপতি ও বৃক্ষলতা প্রকাশিতব্য - পরীবাগান (উপন্যাস)।

পয়স্বিনী

অঞ্জলি দাশ

এই দেবী স্নানে এলে,

নদী ভেসে যায় দুগ্ধফেননিভ জলে

আর যত অভুক্ত শুশুক প্রথম অমৃত স্বাদে অমরত্ব পায়।

আলোহীন শৈবাল প্রাসাদে

লুকোনো রয়েছে তার ঝিনুক জন্মের

বিন্দু বিন্দু অভিমান।

ব্যক্তিগত বিগ্রহের কাছে প্রেমের আর্তি রেখে

যত অবিশ্বাস ধারণ করেছে বুকে

তা থেকেই জন্ম এই রত্ন আকর।

একে যতই মুক্তো বলি,

আসলে ও ঋতুরক্ত, আসলে ও বিষের ছোবল।

কত জন্মে শুদ্ধ হবে মুগ্ধতার পাপ

এখনও জানে না,

শুধু জননীর ছদ্মবেশে আসমুদ্র বশে রাখতে জানে।

শব্দ সন্ধান

স্বর্ভানু সান্যাল

আমাকে যতটা তুমি চিনেছ প্রবাল
তার থেকে আরও বেশি নীল আমি দীর্ণ ব্যাথাতুর
সন্ধেতারার মত চুপ করে চেয়ে আছি পৃথিবীর পানে
ক্লিন্ন হতে থাকা দিনান্তের সূর্যেরা জানে
কত ভগ্ন জীর্ণ মন্দিরের গোপন চাতালে
ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দাঁড়িয়েছি আমি। শালে ও পিয়ালে
দীর্ঘতম ছায়ার শরীর দিয়ে ঢেকেছে আমার
মৃত্যু ও মিথ্যা। মরা কথাদের ক্লান্ত সমাহার
ভীড় করে এসেছে আমায় ছুঁতে
অযুতে নিযুতে
কনকচন্দন সুবাসিত সুরম্য শরীরে
মরা তারাদের অর্থহীন ভিড়ে
হেঁটে গেছি ছায়ার মতন।

খুঁড়ে দেখো প্রবাল খুঁড়ে দেখো এ হৃদয় গহন
হয়তো খুঁজে পাবে চেনা বাস্তুসাপ
কিম্বা সহস্র বছরের পুরোনো জলছাপ...
যে সকল গোপন কোটর
শব্দেরা ছোঁয় নি কখনো, রাত্রিভর
সেইসব অনুভব খুঁজে ফিরি আমি।
জানে, সে কথা জানে আমার অন্তর্যামী।
আমার শুধুই খোঁজা, কেবল সন্ধান
অনন্ত রাত্রি ধরে আমার অলীক শম্পান
শব্দ ফিরি করে ফেরে জীবনের বন্দরে বন্দরে
মৌন মুখর আমি একা জাগি রাত্রি নদী চরে।

স্বর্ভানু সান্যালের জন্ম জলপাইগুড়িতে। ছাত্রজীবন কেটেছে খড়্গপুর, পুরুলিয়া, হাওড়া ও দুর্গাপুরে। কর্মজীবন শুরু বেসরকারি সংস্থায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে। শেষ দশ বছর ধরে আমেরিকার শিকাগোয় কর্মরত। "যযাতির ঝুলি" (https://jojatirjhuli.net/) নামে তার ব্যক্তিগত ব্লগের মাধ্যমে তার লেখা নিয়মিত পাঠকদের সাথে ভাগ করে নেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পত্রিকায় তার লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। লেখকের বই "যযাতির ঝুলি - এক ডজন গপ্পো" এ বছর বিখ্যাত পত্রভারতী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্য মেঘ নামক একটি ডিজিটাল পত্রিকার সম্পাদনার ভার নিয়েছেন তিনি কিছুদিন হল।

বৃষ্টি এলে

সুদীপ্ত বিশ্বাস

বৃষ্টি এলে বুকের ভিতর গোলাপ কুঁড়ি ফোটে
বৃষ্টি এলে মনটা বড় উদাস হয়ে ওঠে।
বৃষ্টি এলে শিউলিতলায়, ছাতিমগাছের ডালে
মনটা বড় কেমন করে বৃষ্টি-ঝরা কালে।
এখন তুমি অনেকদূরে না জানি কোনখানে,
ভিজছো কিংবা গুনগুনিয়ে সুর তুলেছো গানে।
তোমার গানের সেই সুরটাই বৃষ্টি হয়ে এসে
টাপুরটুপুর পড়ছে ঝরে মেঘকে ভালবেসে।
মেঘ বিরহী,কান্নাটা তার বৃষ্টি হয়ে ঝরে
তোমার বুঝি মেঘ দেখলেই আমায় মনে পড়ে?

বীজ

সুদীপ্ত বিশ্বাস

যেভাবে তারার পাশে গ্রহে-গ্রহে জেগে ওঠে প্রাণ
জ্যোৎস্নার পরশ পেলে পাহাড়ও তো গেয়ে ওঠে গান।
আলো-জল-মাটি পেলে সেভাবেই বীজ জেগে ওঠে
হাজার বছর পরে দীঘি জুড়ে নীলপদ্ম ফোটে।
কত আশা, কত স্বপ্ন, কত ধৈর্যে সব চেপে রেখে
সময় সুযোগ পেলে ফুলে-ফলে ছবি দেয় এঁকে।
চতুর্দিকে অমানিশা, প্রাণঘাতী কত চক্রব্যূহ
লুকিয়ে ঘুমিয়ে থাকে চারাগাছ, গোটা মহীরুহ।
আধো আধো ঘুমে মোড়া রহস্য লুকিয়ে আছে কী যে
গোটা এক মহাকাব্য লেখা থাকে অতিক্ষুদ্র বীজে।

কিছু কথা

সুদীপ্ত বিশ্বাস

কিছু কথা না শোনাই ভাল
ভুলে যাওয়া ভাল কিছু কথা,
কিছু কথা শুধু ভেসে যায়
দাগ কাটে কিছু নিরবতা।

কিছু কথা যায় না তো ভোলা
কিছু কথা বেমালুম ভুলি,
কিছু কথা শুনে সুখ পাই
কিছু কথা বলে কান মুলি।

কিছু কথা, মানে নেই কোনও
কিছু কথা বড়ই ভাবায়,
কিছু কথা দেয় দূরে ঠেলে
কিছু কথা ডাকে, আয় আয়...

কিছু কথা, যেন পেঁজা তুলো
এদিক ওদিক যাক উড়ে,
কিছু কথা চড়ুক চিতায়
ছাই হয়ে যাক জ্বলে পুড়ে।

কিছু কথা, যাক থেমে যাক
কিছু কথা বল তুমি প্রিয়,

কিছু কথা ডাস্টবিনে রেখে
কিছু কথা বুকে তুলে নিও...

শূন্যতা

সুদীপ্ত বিশ্বাস

দিনকে ফাঁকি দিতে পারলেও
রাতের কাছে হেরে যাই রোজ!
স্বপ্নেরা সব মুখ থুবড়ে পড়ে
চোখের জলে বালিস ভিজতে থাকে।

তারপর খুব ক্লান্ত হলে,
গভীর ঘুমে পাই মৃত্যুর স্বাদ।

সারারাত জ্বলতে-জ্বলতে
রাতের তারার সলতে ফুরিয়ে যায়।

আবার একটা দিন...
আবার ছোটা শুরু

সুদীপ্ত বিশ্বাস,জন্ম ১৯৭৮,নদিয়ার রানাঘাটে।
কবিতা লিখছেন ১৯৯২ সাল থেকে।কবির কবিতা প্রকাশিত হয়েছে শুকতারা, নবকল্লোল, উদ্বোধন, কবিসম্মেলন, চির সবুজ লেখা, তথ্যকেন্দ্র, প্রসাদ, দৃষ্টান্ত, গণশক্তি ইত্যাদি বাণিজ্যিক পত্রিকা ও অজস্র লিটিল ম্যাগাজিনে। কবিতার আবৃত্তি হয়েছে আকাশবাণী কলকাতা রেডিওতে। ঝিনুক জীবন কবির প্রথম বই। ২০১০ এ প্রকাশিত হয়। এরপর মেঘের মেয়ে, ছড়ার দেশে, পানকৌড়ির ডুব, হৃদি ছুঁয়ে যায়, Oyster Life বইগুলো এক এক করে প্রকাশিত হয়েছে। দিগন্তপ্রিয় নামে একটা পত্রিকা সম্পাদনা করেন। কবি পেশাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। স্বরবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত তিন ছন্দেই কবিতা লেখেন।বড়দের কবিতার পাশাপাশি ছোটদের জন্যও কবিতা লেখেন।

জীবন যেমন

নুপুর রায়চৌধুরী

শেষ শৃঙ্গের মাথায় দাঁড়িয়ে
লোকটা যখন ঝাঁপ দিলো
সটান নীচে
সকলে ভিড় করে মাথা নেড়ে
অনেক কিছু বললো
আসলে কথা দেবার আর
খেলাপের খেলাটা সে নাকি মোটেই
করায়ত্ত করতে পারেনি
কিংবা উর্বশী না কোন অপ্সরার
শুধু একটু ভালোবাসার অভাবে
জীবনটা খুব ভারী হয়ে গেছিল
এরকম আরো কত কি
একটা পাগল আর একটা ভবঘুরে
কিচ্ছু বলে নি
আসলে ওরা তখন বুঁদ হয়ে
গিলছিল চারপাশের
কনেদেখা আলোর হুল্লোড়
পাইন বনের মর্মর
আর ঘরফেরা পাখিদের গান

খোঁজা

নুপুর রায়চৌধুরী

সব তো ঠিকই আছে
তবু দেখো
তপ্তভালে তৃষিত নয়নে
চেয়ে থাকি আজও
কোন এক অসম্ভবের দুয়ার পানে
দুই পয়সা গচ্ছিত রেখে
আমি তো জেনে নিয়েছিলাম
আমার ভাগ্যকে সেই কবে
না পাওয়ার আকাঙ্খা গুলোকে
টুঁটি চেপে
সদর্পে ঢুকে গেছিলাম
শীততাপ নিয়ন্ত্রিত
ঝাঁ চকচকে শয়নকক্ষে
তবু এক্ষণে পাশ ফিরে
ছল করে
চিবুকের নোনা পানির
দিব্যি দিয়ে
তারেই খুঁজি
শুধুমাত্র তাকেই

নুপুর রায়চৌধুরী, জন্ম, পড়াশুনো দেশে। বোস ইনস্টিটিউট থেকে ডক্টরেট করে বিশ্বভারতীতে

শিক্ষকতা করেছেন। লেখালিখির নেশা .

মিশিগানের বাসিন্দা।

দুঃস্বপ্ন

স্বরূপ মণ্ডল

ছোট ছোট কালো কালো বর্ণগুলো দ্বিমাত্রিক
থেকে ত্রিমাত্রিক হয়ে উঠছে। বিদেহ ধারণ
করছে দেহ। তারপর পলকেই প্রকাণ্ড আকার!
আমিও ক্ষয়ে যেতে যেতে নিজেরই মধ্যে লীন
হয়ে যাচ্ছি। মনে হচ্ছে, পিষে দেবে এইবার!
কপালে, নাকের ডগায় জমছে বিন্দু বিন্দু জল।
ঘনঘন শ্বাস পড়ছে। একটা চাপা কষ্ট বুকের
ভিতর থেকে দলা পাকিয়ে উঠছে। স্বাভাবিক
হচ্ছি ক্রমশ। নিকষ কালো রাত্রির দিকে চোখ
মেলে ভাবছি, এতক্ষণ যা কিছু সবই দুঃস্বপ্ন
ছিল। আর আমি সেই স্বপ্নপুরীর একমাত্র লোক
যে দেখেছিল আগামীর পর এক অস্তিত্বশূন্য
'আমি'কে। শঙ্কা জাগে মনে, যা কিছু স্বপ্ন
ছিল, আসলে তা স্বপ্ন নয়, তা ছিল বাস্তবিক।

মৃত্যু

স্বরূপ মণ্ডল

এক একটা আবর্তনের সাথে দেখি এক একটা সূর্যোদয়।
এক একটা সূর্যোদয়ের সাথে শুরু হয় এক একটা দিন।
এক একটা দিন যাপনের সাথে বাড়তে থাকে বয়স।
আমার, তোমার, পৃথিবীর, সূর্যের, মহাবিশ্বের।
এভাবেই এক একটা দিন ডেকে আনে এক একটা মৃত্যু।
তাই, বন্ধ হোক আবর্তন।
প্রতিক্ষণে যে সূর্য মৃত্যুর বার্তা বয়ে নিয়ে আসে
সেই সূর্য অস্তমিত হোক চিরতরে।

জন্ম

স্বরূপ মণ্ডল

মাটি, জল, বায়ু আর আলোয় জারিত হয়ে
সহস্র জন্মের ইতিহাস বুকে নিয়ে অঙ্কুরিত হয় একটি বীজ।
সদ্যোজাত চারাটি জানে না সে কথা।
ভাবে জন্ম তো একটাই!
শক্ত করে আঁকড়ে ধরে মাটি।
ডালপাতা, ফুলে-ফলে মেলে ধরে নিজেকে।
বলে, এসো, ভোগ করো আমায়।

স্বরূপ মণ্ডল
জন্ম ১৯৮২ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারি মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি শহরে।
প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় ‘দুন্দুভি’ নামক পত্রিকায় যেটি কান্দি থেকে প্রকাশিত হতো নয়ের দশকে।
পরবর্তীতে ‘অঙ্গাঙ্গি’ নামক লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক শ্রী অপরেশ চট্টোপাধ্যায়ের সান্নিধ্য লাভ এবং কবিতা প্রকাশ।
এছাড়াও মাধুকরী, পরবাস, তথ্যকেন্দ্র, হাতপাখা, সঙ্গদীপ প্রভৃতিতে কবিতা ও গল্প প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ “প্রতিধ্বনি”।

বেসুরো গান

কুমকুম করিম

তানপুরা র তার বাঁধছি

একটা নিপুণ রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইব -

ঠিক যেমনটি গাইতেন পূর্বা দাম

সারেঙ্গী র ধুলো ঝেড়ে পরিপাটি

একটা নজরুল, ঠিক যেন ফিরোজা বেগম

সকাল থেকে মনের মধ্যে যে ভৈরবী

ভীম সেন জোসির মত

খাপে খাপ সুরে সুর মেলা ছাড়া কোনো গান-

গারদের পিছনে-

আমাদের রাষ্ট্রের কান বড় বেশি সুরেলা-

আস্ত অগোছালো আমির একটা আস্ত বেসুরে গান

রাষ্ট্রযন্ত্রের হাতে ধর্ষিত হতে হতে

শ্মশান স্তূপাকৃতি লাশের ফেয়ার ওয়েল-

এই কালো ধোঁয়ার দিব্বি

আমার বেসুরো গানে গিটার বাজাবে অস্পৃশ্য চে গুয়েভারা

পেশাগত ভাবে একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার (MCA) জন্ম ১৯৮৩ ছোটো মফ্ফল শহর বারুইপুরে। সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা থেকে লেখার চেষ্টা

অরূপ অন্ধকার

দেবাশিস গোস্বামী

অরূপ অন্ধকার যেমন লেগে থাকে পাতার

ভাঁজে ভাঁজে, মেঘের আদল ছুঁয়ে মায়াবী ছায়ায়

নিপাট উজ্জ্বল আলোর ক্যানভাসে রূপকার

হয়ে ভাঙে গড়ে চিবুকের খাঁজে চোখের তারায়

ভাষা দেয়, নক্ষত্র-নিবিড় আকাশ দীঘির অপার

জলে ডুব দিয়ে শান্ত আঁধার জড়ানো শেওলায়

অপেক্ষায় থাকে কবে পাবে মাটির আধার

যে মাটি বিমূর্ত রূপের স্বপ্ন জাগ্রত কায়ায়

লেপে দেবে একদিন, রূপদক্ষ ভাস্কর আঁধার

ফোটাবে নৃত্যের ভাষা সর্ব অঙ্গে ছায়ার রেখায়।

দেবাশিস গোস্বামী পেশায় গণিতের অধ্যাপক, কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট এ কর্মরত। অবসর সময়ে অল্পস্বল্প লেখালিখি, ছবি আঁকা ও তবলা চর্চা করে থাকেন। কৈশোর থেকে এ যাবৎ কবিতা নিয়ে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষার চেষ্টা করেছেন, কবিতা ও অন্যান্য ধরণের বেশ কিছু লেখাপত্র ইতস্তত লিটল ম্যাগাজিনে ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

জামাই-কা ফেয়ারওয়েল

(সুর: Jamaica Farewell)

দত্তাত্রেয় দত্ত

বোশেখ ফেলে রেখে অনেকদূর
আজ পৌঁছে গেছে দোরে জষ্টি ভাই
পড়ল মনে, আমি এই সময়
প্রতি বছরেই তো জামাইষষ্ঠী খাই।

দ্রুত যাচ্ছি তাই, গাড়ি পাই না-পাই
দুঠ্যাঙে ভর করে এগিয়ে যাই
কোঁচা পাকড়ে বাঁয়ে, থলি ঝুলিয়ে ডাঁয়
পায়ে আনকোরা চটিজোড়া চটপটায়।

বেগুনভাজা আর ছোলার ডাল
পাতে খাওয়াবে লুচি ছানা-ডালনা দে'
পাঁঠার কালিয়া ও পাবদা-ঝাল
মিঠে দই রেখেছে পেতে কাল রাতে।

দ্রুত যাচ্ছি তাই, গাড়ি পাই না-পাই
দুঠ্যাঙে ভর করে এগিয়ে যাই
কোঁচা পাকড়ে বাঁয়ে, থলি ঝুলিয়ে ডাঁয়ে
পায়ে আনকোরা চটিজোড়া চটপটায়।

বাঁশেতে ঘেরা কেন গলির মুখ?
দেখে থমকে গেল যেন এ-প্রাণটা
পিছলে ঢুকে যাবো, সে-পথ নেই
তেড়ে এলো কে হাতে নিয়ে রে ডান্ডা।

দ্রুত ছুটছি তাই, গাড়ি পাই না-পাই
দুঠ্যাঙে ভর করে প্রাণ বাঁচাই
কোঁচা বাধছে পায়ে, থলি ছিটকে যায়
চটি ছিঁড়ে গিয়ে হারিয়েছে ও-রাস্তায়।

This is a parody of Harry Bellafonte's *Jamaica Farewell*,

দত্তাত্রেয় দত্ত কোলকাতাবাসী।

অবসরপ্রাপ্ত, তাই লেখেন।

সভ্যতার পিচ-ঢালা গৌরবকে পিছনে রেখে
একটা আদিম পথ ক্রমশ অজানার উদ্দেশ্যে
এখানে চাকা আবিষ্কারের প্রয়োজন হয়নি কোনদিন

পেট্রোলিয়াম-জীবনের শেষপ্রান্তে মুখ ফিরিয়ে
দাঁড়িয়ে সারি সারি বৃদ্ধ ঘোড়ার দীর্ঘশ্বাসে ভেসে আসা
বার্তা— ছ'হাজার বছর ধরে ওদের পিঠে চড়েই
ইতিহাস এগিয়েছে ওদের ঘাড়ের কালশিটেতেই
লেখা হয়েছে সমস্ত জয়গাথা

এখানে গাছেরা আজন্ম ধ্যানী
ইতিহাস ছুঁতে পারেনি ওদের মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো
সরলবর্গীয় মৌনতা সভ্যতা মুখ খোলেনি এই
প্রাচীন গাম্ভীর্যের সামনে এ নিস্তব্ধতা
নিজস্ব অহংকারে বাঁচে ভাঙতে চাইনি
কিন্তু অদেখার এত কাছাকাছি এসে ফিরে যাওয়া
হয় না আমরা এগিয়ে গেছি ধাতব-খুরের ছন্দে

ঐ পাহাড়েও মেলা বসে প্রতিদিন
কিছু চমরীগাই সেজেগুজে পিঠ পেতে দেয়
নির্বিকার ধনুক থেকে ছাড়া পেয়ে
তীর ছুটে চলে লক্ষ্যের দিকে

সস্তায় জাফরান শিলাজিৎ
আমরা টেলিস্কোপে চোখ রাখিনি

কুফরি
নীলাদ্রি সরকার

এখানে বাতাস রোমাঞ্চের নেশা বয়ে বেড়ায়
আমরা সেই নেশায় কোমরে দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়ি
নিচে হাঁ করে থাকে কয়েকশো ফুট শূন্য
মৃত্যুকে মধ্যমা দেখিয়ে সোনালী-আপেলের বাগানে
আমাদের বিশ্রাম তারপর ফিরে আসা

কিছু বিদায়ের চেহারা আবছা হতে হতে
সেঁটে যেতে থাকে বিস্মৃতি নামের স্ক্র্যাপবুকে
আমরা ফিরি সন্ধ্যের মুখোমুখি

সিডার বনের ডাল পাতা বেয়ে তখন অন্ধকার
চুঁইয়ে পড়ছে ওজনে বেড়েছে এই দুর্গমতার
আস্ফালন দ্বিতীয়বার এই পথ পেরোনোর
সম্ভাবনা আমাদের নিঃশ্বাসে ঘন হয়ে আসে

শেষবারের মতো এ নিস্তব্ধতার বুক চিরে
চলতে চলতে মনে হল—
কাওয়ানাকাজিমার অমীমাংসিত যুদ্ধ শেষে
আমরা এচিগো ফিরছি উয়েসুগির সৈন্যদল

নীলাদ্রি সরকার
বেড়ে ওঠা মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি শহরে। বর্তমানে আশুতোষ কলেজে (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) পদার্থবিদ্যায় অনার্সসহ স্নাতকস্তরে পঠনরত। কবিতা লেখার শুরু স্কুল-জীবন থেকে। এর আগে "পরবাস" ওয়েবজিনে কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। শখ, অবসর সময়ে নানা ধরনের বই পড়া, কবিতা লেখা এবং হারমোনিকা বাজানো।

Sophie The Puppy

Amritakshi Sanyal

Chapter 1: All about me

Hi! My name is Sophie. I live at the pet store. I live with my mom, dad, three sisters, and three brothers. I am a little puppy. I am the youngest of all my sisters and brothers. I'm just 2 weeks old. I love to play tag with my brothers and sisters. I also like to play hide and seek with them. Sometimes I hide behind my parents. I'm a puppy with golden fur. That is all about me.

Chapter 2: My cage

My cage is 3 meters long. Its width is 2 meters. It is a long, nice cage. Two sides of the cage are made of hard plastic. The other two sides are made of metal rods. Through the gaps between the rods, I love to see the whole pet store. It is filled with cats, birds, and other dogs like me. This is my world.

Chapter 3: My owner

There was a girl at the pet store who took care of me. People called her Olivia. When I ran to her, she patted me gently. She loved me a lot and I loved her too. She gave me a lot of food in a bowl. She even gave me a nice bath. One day she bought me a doll. I loved that doll and I played with it a lot.

Chapter 4: My family disappears

On some days, people came to the pet store. They took many pets from the store. New pets took their place. One day people took everyone in my family. I was alone in my cage. I thought of my family a lot. It was like they disappeared. One day I heard my owner ask her mom, “Can I take this puppy to our house?'' “Sure, you can take her if you want,” her mom replied.

Chapter 5: Leaving the pet store

Olivia was excited to hear her mom's response. She always asked her mom when she will pet me. But her mom always said, “Soon.” Finally, one day Olivia's mom took me into their house. First Olivia put me in a cage. It was much smaller than my earlier cage. She covered it with a small blanket. It was cozy and warm inside the cage. I fell asleep quickly. When I woke up, I saw that Olivia was patting me gently on her lap and we were inside her house. Olivia's house was nice and decorated. Olivia took great care of me.

Chapter 6: The outside world

One day, Olivia opened a door of her house and took me outside. I saw many things such as the sky, grass, trees, flowers, and something with windows and wheels. I heard Olivia's mom saying, "Come on sweetie, take that puppy inside the car." Then I discovered that the "car" was the thing that had the wheels and the windows. After I went inside the car, Olivia's mom drove us to the pet store. In the pet store I saw the many familiar animals but from outside a cage.

Chapter 7: My new friends

Sometimes Olivia took me to the pet store with her mom. One day, I met two kittens at the store. Their names were Stella and Isabella. They were twins with white fur. Olivia said they were two weeks old, and she let me play with them. I played with them a lot. Olivia laughed when she watched us play.

Chapter 8: Olivia's birthday

One day Olivia was very excited. She kept saying that she was excited for her birthday party. They decorated their house with balloons and colored pieces of paper called confetti. The next day there was a crowd at Olivia's house. In front of me there was a tall cake. "Hi Tim," Olivia said. Tim's parents were Olivia's aunt and uncle. Olivia's uncle had a dog with him. I ran to the dog who seemed familiar. Then I realized that the dog was my mom. "Sophie is that you," my mom asked. "Yes, it's me," I replied. We were so glad to see each other again. My mom petted and cuddled me.

Amritakshi is 9 years old and a grade IV student at Enders Road Elementary School.

Amritakshi Sanyal is

9 years old and a grade IV student at Enders Road Elementary School.

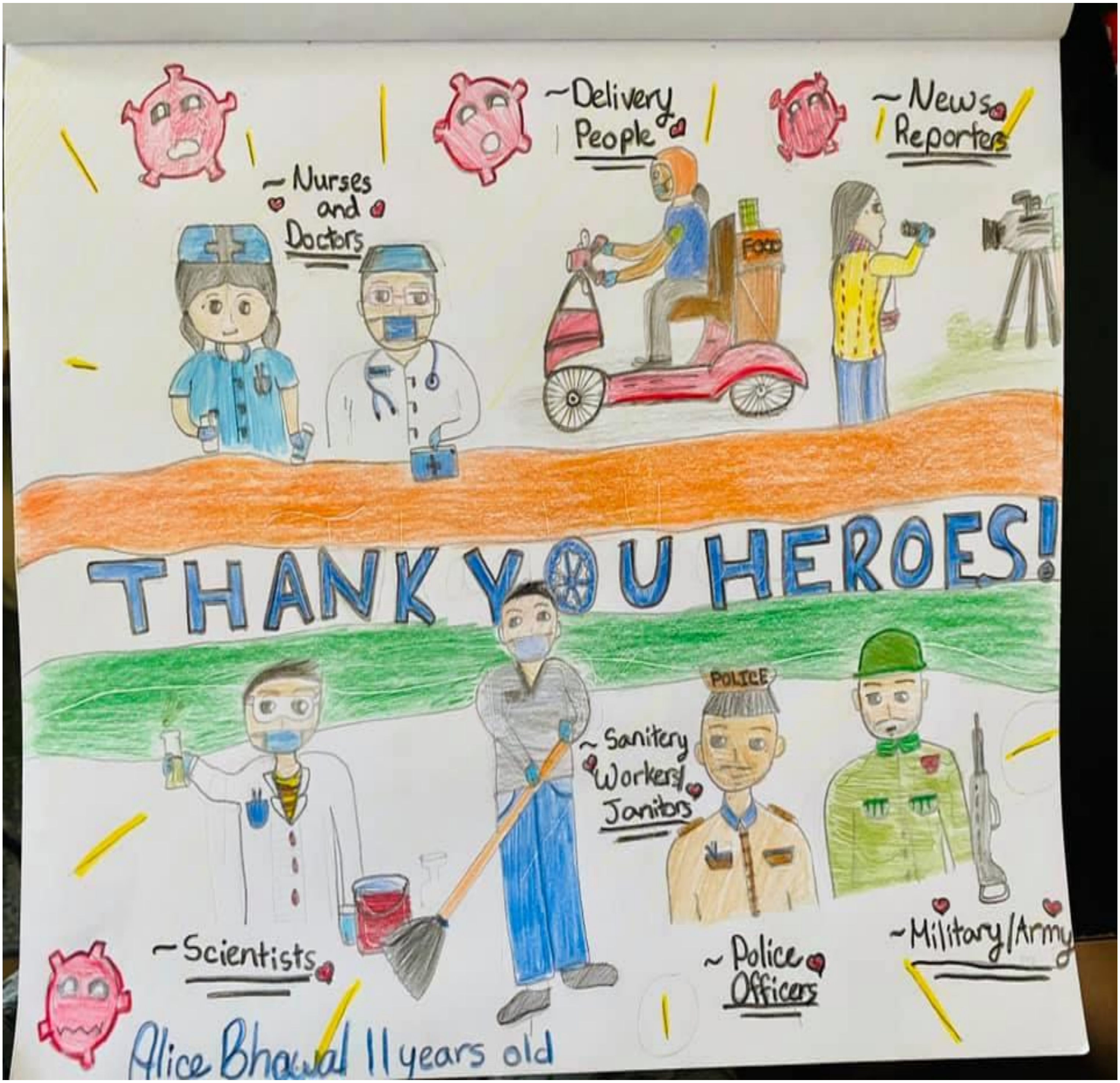

Alice Bhawal: Age11, Grade 5.

She lives in Ithaca N.Y.

The Peacock
Ella Bagchi

I see a crown of blue and yellow,
With eyes that are calm and mellow.
An indigo throat,
And a spotted coat,
Silky and smooth,
Without a single bump or groove.
But, even with its elegant stride,
And supposed everlasting pride,
It is other birds that it admires.
The other birds have what it desires.
No matter how much it would try,
The peacock could never be able to fly.

Ella Bagchi

Age 11

Grade 6

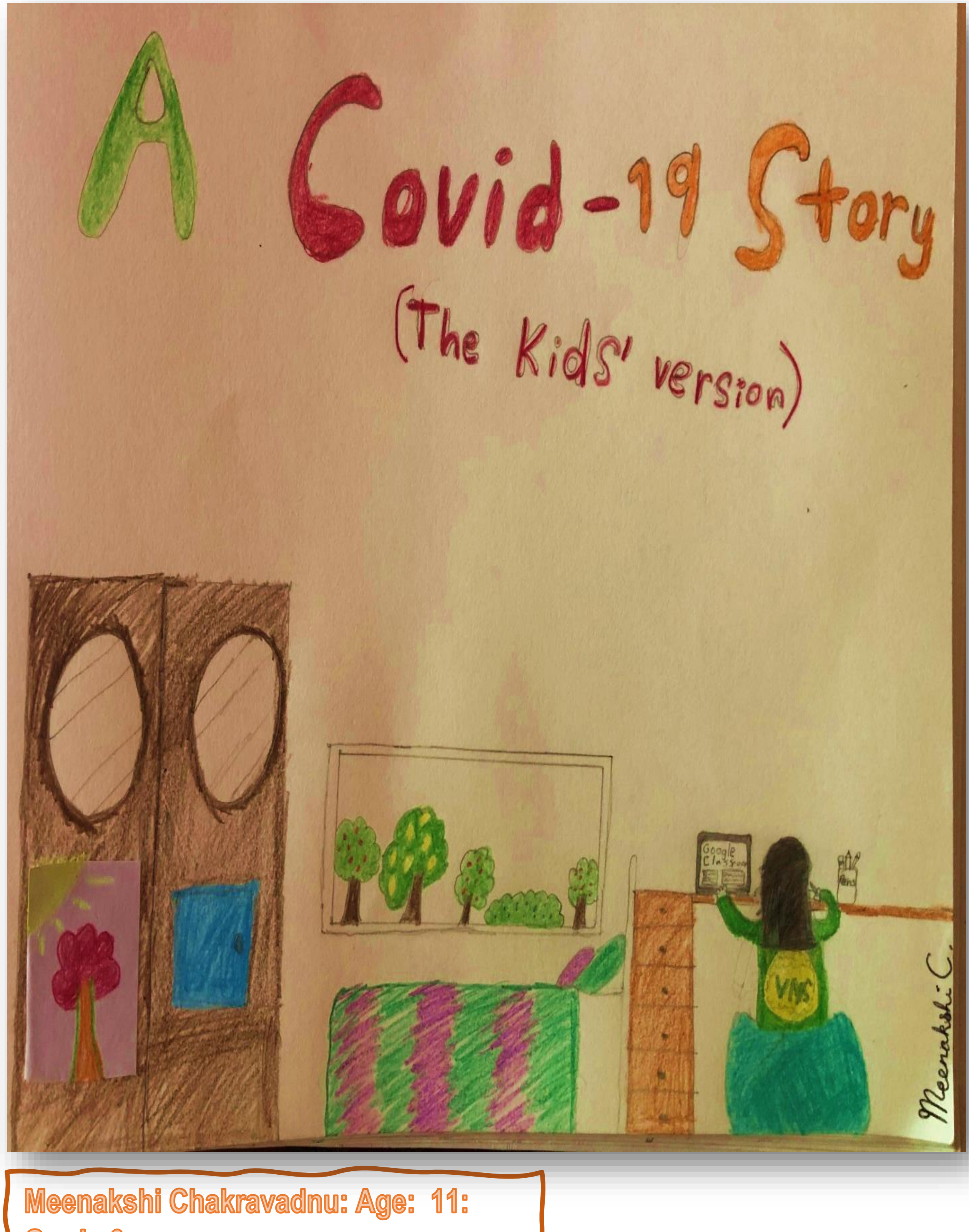

Meenakshi Chakravadnu: Age: 11: Grade 6

Airbus Vs. Boeing: A History of Market Rivalry

Sriram Chakravadhanula

Market rivalry could be quite intense when only two companies compete with each other. With every customer demand, the vendor who responds with a better, faster and more intuitive solution, will earn the glory. The competitor must find other ways to fight back.

Writing the entire history of rivalry between these two companies is a thesis, therefore I will throw light on a few fundamental points of how the two companies

analyzed the market and responded accordingly. Please note that I will be jumping through time from mid 20th century to current time, due to the need to condense my research.

PAST PROGRESSION

After the Jet age began with the first ever Boeing 707 in 1958, Airbus and Boeing both got pulled into a world where jet travel was becoming increasingly popular. The commercial aircraft industry began to grow. Numerous airline companies started popping up due to the increase in consumer demand for personalizing aircrafts. Then started the great race. Both the big companies immediately started creating more efficient aircraft and improving them by the year. Some aircraft in the early stages that were hits included the Boeing 727, and the Airbus 300,310.

hen Airbus created its one and only Airbus 320 in 1987. This aircraft was small, fast, and fuel efficient and it was created to travel short distances. This aircraft was way out of the leagues of Boeing at that point. And this attacked the fundamental concepts of air travel.

If you think about it, Planes were used back then for long range travel. Like New York to London, or Sydney to Delhi. Nobody wanted a flight that did New York to Washington. They just hopped on a train, or car, or boat. But now, with the reduced ticket prices, air travel was the more popular option, and it was faster. Many airline companies prospered.

Boeing needed a new system of air travel. They needed to change the way airlines thought of air travel in order to make money. So, they thought of this genius Idea of the hub system. This is quite the system. Instead of Airline companies putting flights on random important routes and buying flights to fit that specific route, the hub system is where There are two hub airports, like A and B in the diagram below, and multiple smaller airports surrounding it. There would be small, efficient flights such as the Airbus 320 taking passengers from the small airports to the hub airport, and a large long distance aircraft carrying all the passengers from all the surrounding airports to the other hub airport, where again, small aircrafts take the passengers to their designated destination.

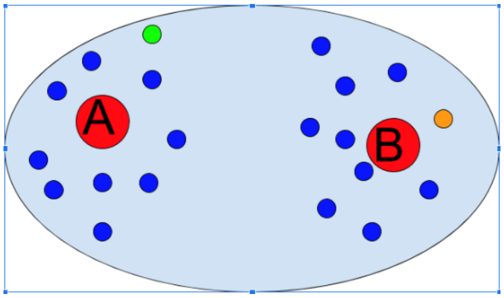

For example, if you would like to go from _Small Airport Green_ to _Small Airport Orange_ you must fly to _Hub Airport A_ and then fly to _Hub Airport B_ and then fly to _Small Airport Orange_. It is a 3-flight routine.

Everyone understood the plan, but there was one flaw, there simply wasn't an aircraft that could carry 600 passengers and travel such long distances such as A to B. Boeing replied by creating their Boeing 747, The Jumbo Jet, which was a 1 ½ story aircraft that held 4 engines. It was the biggest of its time and was very efficient for the time being. This cut costs for the airline companies if not for the passengers.

At this point, we must take into account one important factor. The competition was growing at an alarming rate, so every new airplane release(I'm not mentioning all of them due to large number of releases) was much much more fuel efficient, more high tech, and much more safer than anything before. So, it wasn't long before the Hub system became unideal. It was taking too many airplanes to run, and these airplanes were becoming too old, and expensive to keep up. So, Airbus and Boeing knew a time was coming where they needed to change the system again, something similar to the original. The result was the point to point system.

The point to point system is easy enough to understand. It basically is where and Airline company creates a route from any airport in the world to any other airport in the world. Therefore, decreasing problems of overcrowding in Hub airports and allowing them to flexibly switch their routes to their current needs. The only problem was the aircraft. There wasn't an aircraft that had the travel distance to go around the world. And with large passenger sizes. So now was the start of a new revolution in aircraft flying.

Boeing again was saved by and earlier model called the responded with their new Boeing 757 which was larger than the Airbus 320, but way smaller than the 747. Its range was perfect for transatlantic flights, and flights between countries around the world. So, it was a backup plan for now, however, the market demanded super human planes that could literally travel anywhere to anywhere.

Again, we are skipping a few decades where airbus and Boeing both released airplanes that got larger and larger, and traveled longer and longer distances.

This is where some of the modern aircraft come into play. Boeing created the Boeing 777 in 1998 with multiple models in order to fit into the point to point system. Airbus on the other hand was not ready with their first model of the Airbus 350 till 2012.

THE MODERN DIVERSE MARKET

(BY modern I mean the 21st century)

We must understand the fact that at this point there are multiple systems in place. Just because the point to point system was being responded to, the hub system was still widely in use. If you see a map of all the routes of an airline company, in this case British Airways, you will notice both the hub system, extending outward from London and the point to point system in place, although British Airways decided to focus more on hub system, other airline companies have different routes.

What this creates is a diverse market. Airbus and Boeing had to battle on many fronts because they have to please the customers who would like to follow both the Hub system and the Point to Point system. While Airbus and Boeing worked on the two long haul aircraft (Airbus 350, Boeing 777), They also needed to improve their aircraft for the Hub system. The aircraft that were used at that time were old and weren't efficient. But the companies decided that they didn't need a new aircraft, all they needed was to improve their best flights for the hub system.

THE BATTLE OF THE SMALL PLANES

Airbus wanted to improve on their old A320 and make an engine upgrade that ensures that they have an efficient short-range flight as well. They added new engines to the plane, which were more efficient that the old ones. This enhanced the amazing plane even more and it sold well, to Boeing's displeasure. This was known as the A320 NEO and CEO project. Boeing immediately retaliated with the Boeing 737 Max. Which has basically the same upgrades as the Airbus project? However, something went terribly wrong with the plane. You probably saw the news, right? Multiple Boeing 737 Max's crashing for no apparent reason. Scared the whole world? Boeing launched an immediate investigation and found the problem. The upgrade that took place on this plane was just a new bigger engine. However, this new bigger engine didn't quite fit under the wing, so they moved the engine a little bit forward to make sure it fits. This caused a difference in the Airfoil shape of the wing and caused the plane to tilt too far upward, therefore having a stall. However, Boeing already knew this problem before they released it and they made a software called the MCAS system. This was a system that AUTOMATICALLY lowered the plane's nose when it went up too far. The plane did wonderful in its test runs. The true problem came when they released the plane. They forgot to tell the pilots about the MCAS system. Therefore, they were unable to cut the program when the MCAS system was malfunctioning. The plane kept on ditching downward into a nosedive, and the pilots had no idea what was going on. Thousands died in the process. However now, the pilots know what the system is and how to turn it off in emergency situations. Now the 737 is as safe as any plane.

THE AXE VS THE LANCE

Boeing knew that they needed a new aircraft, Airbus's more modern 350 was easily more technologically advanced. They needed a new idea, one that all airline companies weren't expecting, and they came up with the Boeing 787 Dreamliner. Here is a short description.

Boeing 787 Dreamliner:

It is known as the Dreamliner for a reason. The passenger comfort was the main focus when building this aircraft. The air humidity, sound pollution, food taste, most comfortable seating arrangements, and also the newest engines with the most technologically advanced cockpit at the time. (for more information on the Dreamliner, please check out my article in the 2019 Anjali magazine.)

Airbus was now in a pinch Boeing had so much more options to give airline companies. And the new plane was so advanced and efficient, not only in fuel and money, but also in passenger comfort. That was why Airbus decided to build the world's largest aircraft. The Airbus 380. Here is a short description.

Airbus 380: This airplane was built to be the most versatile aircraft. It could carry the most passengers due to its enormous size, it has an extremely long range, and can go very fast. (for more information on the Airbus380 please check out my article in the 2019 Anjali Magazine)

THE BATTLE FOR AUSTRALIA

As you all know, Australia is in the middle of nowhere. Therefore, in the olden days, the only way to get there was by boat. Even when air travel was becoming popular, boat was still your best option, not only money wise, but because it was one trip. On airplane, it would take you 20 stops, taking something known as the kangaroo route, jumping from here to there all the way to Australia from London. When the Boeing 747 was released, the trip magnificently was shortened to 30 hours, but even the 747 needed one stop.

This is where Airbus and Boeing fought to supply Qantas with the best possible flight. The two companies created their own most modern aircraft that will soon be released. They are called the Boeing 777X and the Airbus 350XWB. Here is a short description on these two aircraft.

Boeing 777X:

The Plane was designed to be mostly made from composites, increasing fuel efficiency and decreasing weight. What is really specially however is this new aircraft's wings. With a new Wing design, which is rarely done on new aircrafts, these wings are more curved and are longer than usual aircraft wings, therefore the wing fold when they are parking so that they don't create more problems for airports. The Aircraft also has the newest engines with complete carbon composite turbines. This is the World's most efficient engine. 12% less fuel per seat than any competing aircraft

Airbus 350XWB:

This plane is going to be more efficient due to new engines(obviously). Since the plane hasn't been released yet, we do not know much about it, except that its fuselage's shape (the body of the aircraft) will be wider. XWB stands for Xtra Wide Body. It is sure to be as amazing as the other planes above.

I hope you learned something about the market history between these two aircraft companies, and I hope you will continue to learn, as I said, it is very difficult to fit all of this information in 2000 words, Have a good rest of your day!

Sriram Chakravadhanula:

Grade 9, age 14.

Sureeta Das

Vicious Virus

Sureeta Das

You look like flu,
But we have no clue about you.

There was no forecaster,
To warn us about spreading faster,
Swifter than cancer,
And finally become the grandmaster of all disaster.

You are so fearless,
That we feel helpless
From this illness.

You are so minute,
Yet you're increasing every minute.

You are invisible,
Yet so invincible.

You infect the society without any barrier,
And make us cope with fear
With respiratory failure.

You are so tricky,
And not at all picky.
You gave us the curve
as a curse.

You gave us economic devastation,
Making us go through frustration.

Why are you being so serious,
And making us anxious.
In spite of being cautious.

All of you should be minus from our lives.
And I wish you were all lies,
flew away like flies.

You are here to rule,
It’s not cool,
to make me miss my school

In our home we are confined,
I wish you could be captivated,
And be arrested.
You should be put in prison,
For your treason.

You taught us how to sanitize,
To avoid getting any other disease.
You taught us not to take advantage
And take life for granted.

You taught us the meaning of family time,
taking a break from our busy lives.
spending some precious time with loved ones of mine.

You taught us social distancing,
And pursuit of virtual mingling.
You gave us a solution,
How to make less pollution.

We learned to appreciate about essential personnel,
To keep us well,

You put nature at its best,
And humankind at its worst.
You became a pandemic to make a panic,
still can't cure you with a tonic.

I wish vaccine could be manufactured,
Then only you could be captured.

You are making me fall on my knees ,
To make a plea,
Not to be so carefree,
And free us from your super contagious spree.

Gods please save us
From this vicious virus!
Relieve the World from this crisis.

Sureeta Das

Grade: 7; Age: 11: Sureeta is passionate about dancing, singing, swimming and proud of her award achievements in Chess and Taw Kwando.

Hridayanshu Das:

Grade: 8,

Age: 13

Galaxy and shooting star in the night sky

Water fountain in front of the Bellagio, Las Vegas

Arpan Dasgupta

New York City from One World Trade Center.

Photo of a sculpture made by Arpan.

Las Vegas from an airplane.

Sunset in New Hartford.

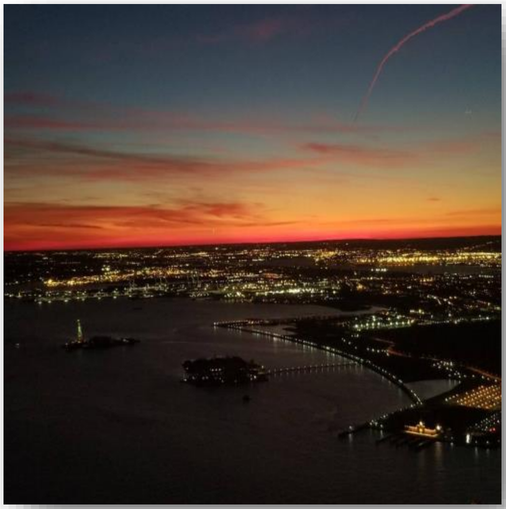

Arpan Dasgupta lives with his parents in New Hartford, New York. Arpan, a 10th grade student, loves to paint and do photography - especially of the night sky full of stars.

টক ঝাল মিষ্টি

অনসূয়া দত্ত

শনিবার সকালে হঠাৎ এক চেনা বন্ধুর ফোন – “আগামী শনিবার 40 years reunion e আসতে পারবি”? কিসের 40 years, কিসের reunion ভাবতে একটু সময় লাগলো। তারপর কথা শুনে বুঝলাম হাইস্কুল reunion নিয়ে কথা বলছে। বলাই বাহুল্য, মাঝখানে যে চল্লিশ বছর কেটে গেছে তা দেহের স্থূলতা দেখে বোঝা গেলেও মন মানতে চায় না। এই তো সেদিন স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে last day বলে Kwality তে আইসক্রিম খেতে গিয়েছিলাম। তারপর এ ওর ডায়েরিতে farewell message লেখা হল, বেশির ভাগই রবীন্দ্রনাথের quotes – ‘পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কিরে হায়’, ’এই স্মৃতিটুকু ভুলোনা ভুলোনা, ভুলোনা’। এই একজন ভদ্রলোক, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আজীবন কোটেশনের জন্য পাশে থাকতে পারেন। তবে মনে আছে এক বন্ধু লিখেছিল ‘Forget me not’ আর আমি লিখেছিলাম, ‘Earth is round, we are bound to meet again’. এর মধ্যে চল্লিশ বছর পেরিয়ে গেল? তা হবে হয়তো – ছোটবেলার গুরুজন স্থানীয় যারা ছিলেন, তারা তো সবাই এখন দেয়ালে যায়গা করে নিয়েছেন আর ছেলেমেয়েদের চোটপাটে বুঝতে পারি যে আমরাও সেই পথে এগোচ্ছি।

যাক গে সেসব কথা, বন্ধুর কথায় আবার সম্বিত ফিরল। ‘জানিস তো অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে, বেশির ভাগ আসবে বলেছে, তুই ও চলে আয় খুব মজা হবে’। কথাগুলো শুনে মনটা তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে কোথায় যে চলে গেল কে জানে, হঠাৎ করে একরাশ অজানা আনন্দের ঢেউ উথলে উঠলো। এক মুহূর্তের জন্য কর্মজীবনের ব্যস্ততা, সাংসারিক জীবনের প্রাত্যহিকতা ভুলে গিয়ে বলে ফেললাম, ‘হ্যাঁ যাব, কোথায়, কখন হচ্ছে সব তাড়াতাড়ি জানা’।

ফোনটা রাখার পরে স্বভাবতই মনটা পুরনো স্মৃতি হাতড়াতে শুরু করলো। স্কুল জীবনের পর কলেজ জীবনে বেশ কিছু স্কুলের বন্ধুকে পেয়েছিলাম, কিন্তু কলেজ জীবন শেষ হতে না হতেই প্রজাপতির নির্বন্ধে আমেরিকার ডাক। যে জায়গাটা ছেড়ে আর কোথাও গিয়ে যে থাকা সম্ভব সেটা কল্পনাও করতে পারতাম না, আটাশ ঘণ্টার ব্যবধানে সে হঠাৎ করে দেশ হয়ে গেল আর যেখানে এসে দাঁড়ালাম সেটা তখনকার মতো থাকার জায়গা। দেখতে দেখতে দিন কেটে মাস আর মাস কেটে বছর।

নিজেকে এই পরিবেশের সঙ্গে উপযোগী করে তুলতে কবে যে আবার পড়াশুনার জাঁতাকলে পড়ে গিয়েছি কে জানে, চমক ভাঙল পাঁচ বছর পর। নতুন কর্মজীবনে ঢোকার আগে মনে হল একবার জন্মভূমিকে দর্শন করে আসি। দুমাসের ছুটি নিয়ে হাজির হলাম আমার প্রিয় কলকাতায়। মনে আছে প্লেন থেকে ‘কলিকাতা বিমানবন্দর’ লেখাটা দেখে কেঁদে ফেলেছিলাম, কতদিন বাদে আবার বড় হরফে বাংলা লেখা দেখলাম।

প্রথমবার দেশে এসেছি, তাও আবার পাঁচ বছর পর - আদর, আপ্যায়ন, নিমন্ত্রণের অন্ত নেই। মায়ের কাছে দু দণ্ড বসে গল্প করার সময় নেই, আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়াটাই প্রধান কাজ। কিন্তু দিন ত আর কারো জন্য বসে থাকে না, সে তার নিজের গতিতে এগিয়ে চলে। দেখতে দেখতে দু মাসের ছুটি শেষ হলো। আবার মায়ের কোল খালি করে প্রিয়জনদের কাছ থেকে বিদায় নেবার পালা। এবারে যেন আর ছেড়ে যেতে

ইচ্ছাই করছে না। মনে আছে কলকাতা থেকে আমি সর্বশেষ যাত্রী বিমানে উঠেছিলাম তার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে একটু বকুনিও খেয়েছিলাম। জানলার পাশে সিট পেয়ে প্লেনের ঘষা কাচের মধ্যে দিয়ে চেষ্টা করছিলাম যদি বাড়ির সকলকে আর একবার দেখা যায়। দূরে কিছু মাথা দেখে তাদের উদ্দেশে শেষবারের মত হাত নেড়ে বিদায় জানিয়েছিলাম, চোখ দুটো জলে ভরে এসেছিল। একটু মনমরা হয়েই plane কিভাবে মেঘের উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে সেই দিকেই তাকিয়ে ছিলাম।

পাশের ভদ্রলোক বোধহয় আমার এই করুন অবস্থা লক্ষ্য করছিলেন তাই আমরা যখন মাঝ আকাশে তখন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বাড়ি ছেড়ে এই প্রথমবার'? নিজের একান্ত আবেগ অচেনা একজনের কাছে প্রকাশ হয়ে গেছে বলে একটু লজ্জাই পেয়েছিলাম। ধীরে ধীরে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে কথা শুরু হল। প্রথম কয়েক মিনিটেই একটা পিতৃ-সুলভ ব্যক্তিত্বের আভাস পেলাম। সদ্য বাড়ির সকলকে ছেড়ে আসার জন্যও হয়তো কথোপকথন বেড়েই চলল। কথায় কথায় জানতে পারলাম তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ৬৫ বছরের তুলনায় দিব্যি স্বাস্থ্যবান। যখন জানতে পারলেন আমিও অধ্যাপকের সঙ্গে জীবন জড়িয়েছি, তাঁর কৌতূহল স্বাভাবিক ভাবেই আর একটু বেড়ে গেল।

এটা ওটা নানান প্রশ্ন করতে করতে এক সময় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমেরিকায় জীবনটা কেমন উপভোগ করছ'? তখন বয়স কম, জীবনটা ঠিক মতো উপভোগ করতে কি কি দরকার জানা ছিল না, আর মধ্যবিত্ত পরিবারের তুলনায় আমেরিকাতে প্রয়োজনের বেশি অনেক কিছু আছে বলে তেমন কিছু চাহিদাও অনুভব করিনি। কিন্তু কাজের বাইরে নিঃসঙ্গ জীবন বড়ই বেদনাদায়ক। তাই এক কথায় বলতে পারিনি 'ভালোই কাটছে'। বলেছিলাম, 'boring, একাকীত্বে ভরপুর'। ভদ্রলোক এক অমায়িক হাসি দিয়ে বলেছিলেন, 'জীবনটা হল অনেকটা স্বাদে টক, ঝাল, মিষ্টির মত – তার প্রতিটি স্তরে এক এক ধরনের অনুভূতি, ঠিক যেমন জিবের প্রতিটি স্তরে এক এক ধরনের অনুভূতি। একটা অন্যটার পরিপূরক। সঙ্গীর সঙ্গে জীবন উপভোগ করার আনন্দ এক ধরনের আবার নিঃসঙ্গ জীবনও উপভোগ করা যায়, আর এখন তো তুমি প্রকৃত জীবন শুরুই করনি। এক সময় দেখবে জীবন এতই ব্যস্ত হয়ে পড়বে যে একটু নিঃসঙ্গতা খুঁজবে নিজের জন্য।

আবার একটা সময় আসবে যখন ঘরে ঢুকে দেখবে বিছানা টান টান করে পাতা, ঘরের সব কিছু পরিপাটি করে সাজানো তার উপর হাল্কা ধুলোর প্রলেপ, চারিদিক নিস্তব্ধ। সঙ্গীর অভাবে মন আকুলি বিকুলি করলেও তার জন্য দুঃখ করার কোন কারণ নেই, সঙ্গী না থাকলে প্রতিদিনের কাজের মধ্যেই সঙ্গী খুঁজে নিতে হয়, ভালো লাগার জিনিষগুলো সঙ্গী হয়ে ওঠে। তাই জীবনে যখন যেটা পাচ্ছো, তার প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করো, কচি পাতার মতো নিজেকে সবসময় সতেজ রাখো। এই দেখোনা এই বয়েসেও আমি নিজেকে কেমন প্রাণোচ্ছল রাখার চেষ্টা করি। আমি কলকাতা থেকে দিল্লী যাচ্ছি আমার বন্ধুদের মিলন সমারোহে – তিন মাস অন্তর আমরা দেশের বিভিন্ন জায়গায় দু তিন দিনের জন্য একত্রিত হই, গান বাজনা, হাসির কোলাহলে ডুবে থাকি, খুঁজে পাই বেঁচে থাকার অক্সিজেন'। তখন ভদ্রলোকের কথাগুলোর মানে ততো ভাল করে বুঝিনি, কিন্তু খুব মনে ধরেছিল। তাই রি-ইউনিয়ন হবে শুনে এত বছর পরে তাঁর সেই কথাগুলো আবার মনে পড়ল। বলাই বাহুল্য, টক ঝাল মিষ্টি জীবনের স্বাদও বেশ ভাল করেই উপভোগ করছি।

দেখতে দেখতে রি-ইউনিয়নের দিন এসে গেল। সকাল সকাল বেরিয়ে অনেকটা ড্রাইভ করে গন্তব্য স্থলে পৌঁছলাম বেলা এগারটা নাগাদ। যে বন্ধুর সুবাদে এখানে আসা তার সঙ্গে parking lot এ দেখা হল। বলতে গেলে ক্লাস ৯ থেকে আমাদের বন্ধুত্ব – এখনো অটুট আছে। তার সঙ্গে আরেকটি মহিলাকে দেখলাম, ঠিক চিনতে পারলাম না। পরিচয় জানতে চাইলে সে বলল, 'আমি ললিতা, আমাকে চিনতে পারছিস'? স্কুল জীবনে একজন ললিতাকেই জানতাম, কিন্তু তার সঙ্গে তো একে মেলাতে পারছিনা। বাধ্য হয়েই আরও sure হবার জন্য last name জিজ্ঞাসা করলাম। পদবী শুনে মনটা ক্লাস টুতে ফেরত চলে গেলো, বললাম, হ্যাঁ নামটা মনে আছে কিন্তু সেই চেহারার সঙ্গে তো মেলাতে পারছিনা। সে হাসতে হাসতে বলল, 'হ্যাঁ রে, ছোটবেলায় যেমন রোগা ছিলাম এখন তেমনি মোটা হয়েছি, কিন্তু তুই একরকম আছিস, মুখটা দেখলেই চেনা যায়'। মনে মনে ভাবলাম, তার মানে ছোটবেলায় আমি এরকম মোটা ছিলাম, মোটেই না। মুখে বললাম, 'না রে, ছোট বেলার থেকে এখন দশ কেজি ওজন বেশি'। তার সঙ্গে কোলাকুলির পালা শেষ করে, রাস্তা পেরিয়ে রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম।

দরজা দিয়ে ঢুকতেই সামনে এক ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'You must be for the Reunion' বলে বাঁদিকের একটা হলঘর দেখিয়ে দিলেন। একটু কুন্ঠার সঙ্গেই আস্তে আস্তে Swing Door ঠেলে মুখ বাড়ালাম। এক পাল ছেলে মেয়ে গল্প করছিল, আমাদের দেখে উঠে দাঁড়ালো। তাদের মধ্যে একজনকে দেখে অবচেতন মনেই বলে উঠলাম, 'সুমিত'! কখন যে দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরেছি, খেয়াল নেই, ঘোর কাটল অন্যদের হাসির শব্দে। তখন দেখি বেশ কয়েকটা মোবাইল ফোন আমাদের দিকে তাক করা – অর্থাৎ ছবি উঠে গেল। না জানি, ফেসবুকে এই ছবি নিয়ে কত আলোচনা হবে। সে হোক গে, চল্লিশ বছর বাদে warm welcome একেই বলে। এই আন্তরিক বাহু বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে আর একবার বাকি মুখ গুলোর সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করলাম। ফেসবুকের কল্যাণে বেশ কয়েকটা চেনা মুখ চোখে পড়লো, কিন্তু একি বেশির ভাগ মুখই ত অচেনা। বুঝলাম চল্লিশ বছর অনেকটা সময়, নাম না জিজ্ঞাসা করলে চিনতে পারার কোন উপায় নেই। অগত্যা লজ্জার মাথা খেয়ে কয়েকজনকে নাম জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হলাম। চোখ পড়ল বেশির ভাগেরই মধ্যপ্রদেশ বেশ উন্নত আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কপালের পরিধিও উন্নত হয়েছে। দেখতে দেখতে আরো বেশ কিছু বন্ধু বান্ধব এসে জড়ো হল, সর্বসাকুল্যে জনা তিরিশ।

শুরু হল স্কুল জীবনের ওঠাপড়া নিয়ে গল্প। কোন টিচার পড়া না পারলে ক্লাস থেকে বের করে দিতেন, কোন টিচারের মাঝ রাস্তায় ধুতির কোঁচা খুলে গিয়েছিল আবার কোন টিচার আমাদেরই এক বন্ধুর সঙ্গে ব্যর্থ প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছিলেন। coeducation স্কুলে পড়ার দরুন মেয়ে বন্ধুর পাশাপাশি ছেলে বন্ধুর সংখ্যা কম ছিল না। একদম ছোটবেলায় ছেলেদের এড়িয়ে গেলেও ক্লাস সেভেন থেকে তাদের সঙ্গ ভালই লাগত। তখন শুনেছিলাম এবং বুঝেছিলাম যে এই বন্ধুত্ব একটু ঘনিষ্ঠ হলে তাদের প্রেম করা বলে।

ক্লাস নাইনে উঠে সেই ঘনিষ্ঠতা দেখেছিলাম দীপ আর শ্বেতার মধ্যে। শ্বেতা ছিল আমার কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে একজন। শ্বেতার জন্য যে ওর মায়ের কাছে কত মিথ্যা কথা বলেছি ভাবলে আজ অনুতপ্ত হই, কিন্তু তার থেকেও বেশি অনুতপ্ত হয়েছিলাম যেদিন দীপের কাছে শ্বেতার বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় পেয়েছিলাম। এখন শ্বেতা কলকাতা শহরের একজন বড়ো সেলেব্রিটি আর আজ দীপকে দেখেও ভাল লাগলো যে সেও ভালভাবে নিজের জীবনটাকে গুছিয়ে নিয়েছে।

শুনলাম কিছু বন্ধুদের জীবনে সংগ্রামের পাশাপাশি সফলতার গল্প। চলতে থাকলো বিরিয়ানি, চপ, কাটলেটের সঙ্গে ছোটবেলার গল্প গুজব, তামাশা আর হাসির ফোয়ারা। সেই ছোটবেলার টিফিনে যেমন এ ওর টিফিন শেয়ার করতাম, আজ আবার সেই ভাবে এ ওর প্লেট থেকে খাবার তুলে নিজে খাচ্ছি, অন্যকে খাওয়াচ্ছি আর চা/কফিতে চুমুক দিতে দিতে হেসে গড়িয়ে পড়ছি। তিন ঘন্টার meeting, eating কখন যে পাঁচ ঘন্টা পার করে দিয়েছে খেয়াল হয়নি, খেয়াল হল যখন restaurant ম্যানেজার এসে জানাল যে ডিনার এর জন্য তাদের রেডি হতে হবে, তাই আজকের মত ক্ষান্ত দিতে হবে।

অগত্যা, সভা ভাঙতে হবে। কিন্তু কেক কাটা না হলে celebration অসম্পূর্ণ। সবাই হুমড়ি খেয়ে পরলাম কেকের উপর – আমাদের স্কুলের logo ‘courage to know’ দিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে। মনে আছে ক্লাস সিক্সে প্রিন্সিপাল বলেছিলেন, ‘পৃথিবীকে কলুষ মুক্ত করতে যারা অবাধে, অসঙ্কোচে দুঃখ কষ্টর মধ্যে দিয়ে নিজেদের জীবন কাটাতে পারে তারা যে শুধু বলিষ্ঠ হয় তা নয়, তাদের একাগ্রতা সমগ্র সমাজকে নির্মল করে তোলে। যে কোন বিষয়ে সফলতা অর্জন করতে একমাত্র মনের বল এবং একাগ্রতার প্রয়োজন’। পরে অনেক বড়ো হয়ে জেনেছিলাম, ‘Success is not for the faint of heart’.

এবার বিদায়ের পালা। আবার আর এক প্রস্থ কোলাকুলি, করমর্দন করে যে যার গাড়িতে গিয়ে বসলাম। মনে হল, হঠাৎ করে একটা অদৃশ্য টাইম মেশিনে চড়ে একদল পঞ্চাশোর্ধ্ব পুরুষ, মহিলা কিভাবে কয়েক ঘন্টার জন্যে পনের বছরে ফেরত গিয়েছিলাম – আবার মনে পড়লো সেই ভদ্রলোকের কথা – মাঝে মাঝে পুরনো বন্ধুদের হাতছানি জীবনকে সতেজ করে তোলে। কি জানি আরো দশ বছর বাদে, পঞ্চাশ বছরের পুনর্মিলনে আমাদের ভবিষ্যৎ কিরকম হবে, চোখ, কান, নাক নিয়ে যে ইন্দ্রিয়গুলো আজ বেশ চাঙ্গা আছে তারা না বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে, শিথিল করে তোলে আমাদের স্মৃতিশক্তির বাঁধন। গাড়ি চালাতে চালাতে দেখলাম ফোনের স্ক্রিনে message ভেসে উঠল, ‘যুগ যুগ জীও শৈশবের বন্ধুত্ব, আসছে বছর আবার হব !

ইথাকা, নিউ ইয়র্কের দীর্ঘদিনের বাসিন্দা এবং কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগে কর্মরতা,

অনসূয়া ইদানীং কালে তার শিল্পী সুলভ চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে আগ্রহী। এই গল্পটি তারই একটি ছোট প্রয়াস।

অনন্ত

হীরক সেনগুপ্ত

১

আগে লোকজন বৃদ্ধাবাস বলত।

বৃদ্ধাবাস! শুনলেই একদল নাক কুচঁকায় । একটা ধারণা আছে । এখানে আপদগুলো থাকে। পরিবারের সবাইকে জ্বালিয়ে শেষ করা ওল্ড হ্যাগারডসের ডাঁই করা স্তুপ । ভুল । একশো ভাগ ভুল। কোন বৃদ্ধাশ্রমই এমন নয় ।

২

'চু-কিৎকিৎ' ও নয়।

৩

এরকম ভুল ধারণা কতই থাকে জীবনভ'র । দেখা যায় খাতায় কলমে যাই থাক ভেতরটা অন্য । না ঢুকলে বোঝা যায় না । ভেতরটা না দেখেই কত অন্য মানে করে লোকে !

৪

বাহারি বোর্ডে লেখা:চু কিৎকিৎ । বড় অক্ষরে রাতে উজ্জ্বল আলো লাল-হলুদ ।

এর সীমানা বরাবর অনেক গাছ। শাল, ঝাউ, ইউক্যালিপটাস, জারকোন্ডা, কৃষ্ণচূড়া, পলাশ,শিমুল নাগকেশর ।

৫

এলাকাটা অনেকটাই বড় । বাচ্চারাও খেলতে চলে আসে। বাধা দেওয়া নিষেধ । একটা ছোট্ট গেট আছে ।বাশেঁর । সেটা টপকানো যেত ।বিশেষ বিশেষ দিনে ঐ গেট খুলে যায়।

৬

চু কিৎকিৎ চারতলা। প্রত্যেক ফ্লোরে পঁচিশটা ঘর । লিফ্ট,এস্কেলেটার আছে । আর একটা মজা আছে। স্লিপ খেয়ে নামার জন্য বিশেষ চেয়ার । সেখানে বসে সুইচ টিপলেই শোঁ । উপর-নিচ করা যায়। ঘুরপাকে ।

৭

এখানে যারা থাকেন বয়স সবারই ষাটের ওপর। সবচেয়ে কমবয়সী কিরণ আইয়ার। পঁয়ষট্টি। এরপর থেকে নব্বই পর্যন্ত। বিভিন্ন ভাষাভাষী হলেও ইংরেজী সবাই জানেন। হিন্দি বাংলা ভাঙা ভাঙা।

৮

অন্যান্য কাজের জন্য আছেন আরও শ দুয়েক । ওদের থাকার আলাদা ব্যবস্থা । সামনে পেছনে ছিটিয়ে ।

৯

একটু বাইরের দিকে ব্যাংক । টোটো। চকলেটের দোকান। ডাক্তারখানা । স্টেশনারি শপ।

১০

ভেতরেও পার্ক। শ্যালো সুইমিং পুল।

যাবতীয় ইন্ডোর-গেম ।অনেকেই শৈশবের ছড়া-কাটা খেলাগুলোও বেশ এনজয় করেন। হারিয়ে যাচ্ছে এমন অনেক খেলা।

১১

দোল । দুর্গোৎসব। নিয়মিত । বিজয়া-দশমী তো আছেই । তখন আরও জমজমাট ।

দরকার মতো বসে গ্যাসবেলুন । ফুচকা ঝালমুড়ি । কুলের আচার । হজমীওলা । এমন লোকও আছেন ।

১২

তবে এসব শুনে মনে হতে পারে এনারা বাইরের লোক । এই কাজগুলো যারা করেন কেউ বাইরের না । এখানকার লোক আর এনারাই করেন । আনন্দের সঙ্গেই করেন।

১৩

'চু-কিৎকিৎ'তেই থাকেন। অবসর বিনোদন তো বটেই । বেশ খানিকটা ছেলেমানুষিও আছে। পেশা ও কাজের চাপে শৈশবের যে ইচ্ছাগুলোয় তালা পড়ে যায় , এখানে সেসব মুক্ত । ভালোলাগার বন্ধ কুঠুরি এখানে আপনা থেকেই খুলে যায় । হা হা করে হাসে।

১৪

এখানেই যিনি ছাতা মেরামত করতে পছন্দ করেন, ছিলেন ভাইস চ্যান্সেলর । শুদ্ধোদন । আর ওই যে ঐ যিনি আজ ঝালমুড়ি বানাচ্ছেন ইকবাল । কার্ডিওলজিস্ট। ফুচকা নিয়ে বসেন শচীন অরোরা । দুঁদে ক্রিমিনাল ল'ইয়ার ।

বর্ষায় দিনে ফুলুড়ি চপটপ ভাজেন সীতারাম জানা । সাইক্রিয়াট্রিস্ট।

১৫

মনে হতে পারে এনারা কি সত্যিই এসব কাজ করেন! কেন, কি জন্য করেন! এনাদের তো অভাবটভাব...

ওখানেও একটা গড়পড়তা ভুল আছে । অভাব থাকাটাই কি সব? শৈশবের কত ইচ্ছে শিশুরা খোলা মাঠে, গাছের কোটরে, নদীর ধারে , সার্কাসের জোকারের পকেটে লুকিয়ে রেখে যায় ...তার কি কোন হিসাব আছে ?

১৬

এখানে যিনি গান শেখান,ক্ল্যাসিক্যাল সপ্তাহে দু'দিন ,ঐযে এখন গেট পাহারা দেন । মধু আদক । ব্যাঙ্ক ম্যানেজার।

মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ফুল-মালা নিয়ে বসেন ...ঐ হলেন মিস্টার সূর্য লোহিয়া । ছিলেন রেলবোর্ডে।

১৭

সব ব্যবস্থাই আছে । তবে শেষকথা যার যেমন ইচ্ছে। বিক্রি তো আসল কথা নয় । আসল হল আমি আমার মতো। এসব হল ভালোবাসার প্রজাপতির ওড়ানো।

১৮

আজ যা নিয়ে হৈচৈ সেটা বিরল । অভিনব। আজ কিরণের বিয়ে।

১৯

পুরো নাম কিরণ আইয়ার । বয়েস পঁয়ষট্টি ।

পিঠের দিকটা কুলোর মত হয়েছে । চুল সাদাই । টানা টানা চোখ বড়। ফর্সা । দাঁত নেই । গাল বসে গিয়েছিল । এনারাই বাঁধানোর পরামর্শ দেন । এখন ফিটফাট । ভাঙাচোরা যা কিছু হাসিতে মিলিয়ে গেছে। । চামড়া কুঁচকেছে । মুখে অনেক মানানসই ভাঁজ । সব ভাঁজের মধ্যে মজা আর হাসি লুকিয়ে । গান গাইতে পারেন ভালো । চমৎকার উলকাঁটায় হাত। এখানে সবার জন্যই বাহারী সোয়েটার বুনেছেন।

২০

এখন আরথ্রাইটিসে পঙ্গু । হুইল চেয়ারেও সপ্রতিভ। একসময়য়ের নার্স । পালা করে ডাক্তার জানা আর ডাক্তার ভট্টাচার্য দেখে যান । উনি হেল্থ ফলোআপ করেন।

এক ছেলে । প্রবাসী । ফোনেই যোগাযোগ । কিরণ এসেছেন বছর দুয়েক। হাজব্যান্ড মারা যাবার পর ।

২১

কিরণকে সাজাচ্ছেন তিনজন।

সুনন্দা বসু । প্রিন্সিপাল ছিলেন । ইনি কিৎকিৎয়ের ওয়াল-ম্যাগাজিন 'এই আমি' সম্পাদনা করেন। অলংকরণের দায়িত্ব বংশীবাবু সামলান।

শিমরান কৌর একসময়ের সাংবাদিক, পোশাক ডিজাইনিংও ভালোবাসেন ।

মালা রায়চৌধুরী। বিউটিশিয়ান। কিরণের চুলসেট করছেন । ব্রাইডাল মেকআপ দায়িত্বটাও ওনার ।

আর, সুনন্দা আর শিমরান, কিরণের বিয়ের পোশাকের দায়িত্বে। লেহেঙ্গা আর মেখলার মিক্স এন্ড ম্যাচ ।সবার পছন্দ

২২

বিয়ে ব্যাপারটাই বেশ মজার । শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মজায় মোড়ানো । কেমন যেন পুজো পুজো ভাব ।

অনেক বলবে বিয়ের মধ্যে আবার পুজো পূজো ভাব কি? আসলে থাকে । সব থাকে । শুধু একটু নিজেকে পাল্টে খুঁজে নিতে হয় ।

২৩

শেষে আছে খাওয়া দাওয়া। পেল্লায় হাড়ি কড়াই হাতা খুন্তি । এলাহি কান্ড । কেটারিং সামলাচ্ছেন মনীশ আগরওয়াল আর মধুসূদন ত্রিবেদী । এলাকাটা তো খুব নয় । লোকজনও অনেক । আরো অনেকেই বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত ।

২৪

ফুলের দায়িত্বে সূর্য লোহিয়া । বয়স একাত্তর । ওনার স্ত্রী মোটর অ্যাকসিডেন্টে পারালাইজডস হয়ে যান । পঙ্গু হয়েছিলেন কুড়ি-বছর। নিঃসন্তান । দেখাশোনা অনেকটাই লোহিয়া করতেন। বাদবাকি নার্স । স্ত্রী মারার যাবার পর এখানে আসেন। বছর পাঁচেক আগে।

ডেকরেশন বংশী হাড়ি, চন্দন ভট্টাচার্য । দুজনেই ডাক্তার । বিয়ের দায়িত্বে চন্দন আর ইকবাল । ইকবালই এখানে একমাত্র সস্ত্রীক থাকেন।

২৫

তবে সব থেকে মজার হলো এসব এখন আর কেউ মনে রাখেন না । আগের জীবন ভুলে গেছেন। এইখানে থাকার পর মোটামুটি আগেকার জীবন শিশিরের মত মিলিয়ে যায়। সব মিলিয়ে এখন থাকেন পঁচানব্বই।

গত বছর দুজন মারা গেছেন। অর্চিতা গুহ। আর ভূদেব কুন্ডু। দুজনেই একটু অসুস্থ ছিলেন।

২৬

ইকবালের স্ত্রী এসে বললেন ,

'ওনারা বলছেন, একটু তাড়াতাড়ি করতে '

মালা বলল,'অত তাড়া দিলে হয় । এখনও কিরণের হাতের মেহেন্দী শুকায় নি '

ইকবালের স্ত্রী, নিশাই সবার হাতে মেহেন্দী পড়িয়েছেন। শিমরানও পড়েছে । কালকেই ।কিরণের হাতেও ছিল । একটু ধেবড়ে গেছে । তাই আবার ম্যানেজ করতে হল ।

সুনন্দা ঘড়ি দেখে 'এখন পাঁচটা। লগ্ন সাড়ে পাঁচটা বত্রিশ।ঢের দেরী'

নিশা বলল,'আমি বাবা আর যাচ্ছি না । ওদের তাড়া দেবার স্বভাব। আমি এখন মেকাপ দেখব'

নিশাও জুটে গেছে।

২৭

সঙ্গে হাসি ঠাট্টা চলছিলই । নিশা আসাতে বাড়ল । নিশাই শুরু করল এক পশলা মস্করা।

'কিরণ, ভাই আপনার টেনাসিটি আছে ।এতদিনে সাইলেন্ট লাভ! অন্যজন জানতেই পারেননি । নিশার কথা শেষ হল না...

ওরাও বলে ...'ইয়েস ...উই মাস্ট সেলিব্রেট রেয়ারেস্ট অফ দ্য রেয়ার অকেশন ইন আ সিনটিলেটিং ওয়ে .... ওয়াও গ্র্যান্ড অকশেন ...

কিরণের মুখ লাল হয়ে ওঠে । সবাই এখন ওকে তুলে ধরে ঐ মিক্স এন্ড ম্যাচ পড়াচ্ছে । ময়ূরকন্ঠী রঙ। চমৎকার লাগছে বিয়ের সাজে । ফটফট সেলফি তোলে নিশা ।

'হবে না । মুখ তোলো। কিরণ স্মাইল .... বাহ!'

শিমরান ক্যামেরা আনে । স্পোর্টস মোডে । একবারে বারোটা উঠল ।

২৮

এইসব করতেই সময় হয়ে যায়। সূর্যকেও একটু সাজানো বাকি । মালা আর শিমরান ফোন করে।

'মিস্টার লোহিয়া...কুইক কাম হিয়ার ' মালা বলল,'উনি লজ্জা পাচ্ছেন।লেটস কাম ওভার টু হিস প্লেস'

সূর্য ফুলের তোড়ায় সাজাচ্ছিল কিরণের সিংহাসন-চেয়ারটা । স্পেশাল অর্ডার দিয়ে বানানো। 'লোহিয়া ইয়ার আর উই গেটিং লেট কুইক '।

২৯

সাজানো শেষ । চমৎকার দেখাচ্ছে। হুইলচেয়ারে কিরণকে নিয়ে বসিয়ে দিল । তখনও বেশ কয়েকটা ছবি তুলল মালা।

৩০

ওরা ছোটে সূর্যের ঘরে । ফিনিশিং টাচের জন্য । এমনিতেই হ্যান্ডসাম । দেখে এতটা বয়েস বোঝা যায় না । রোবাস্ট । তবুও একটু সাজগোজ তো লাগেই। বিয়ে বলে কথা।

৩১

অল্প সময়। মেয়েরা এখন মালার রুমে । ওয়েডিং টাচআপ । সবাইকে সাজিয়ে দিচ্ছে । শিমরান ঘিয়ে মেখলায় লাল সুতোর কাজ -সাদর, এমব্রয়ডারড রিহা,সুনন্দা মেজেন্টা বালুচরী । নিশা , হলুদ পাতিয়ালা কামিজ আর হাল্কা মেরুন ফিরন ।

মালা পড়েছে ইন্নাফি আর সারঙ ।

৩২

স্মৃতি যেমনই হোক আজ অন্য থ্রিল। পৌষের বেলায় শীতের অন্ধকার। লোকজন আসছে । শামিয়ানা। আলো ঝলমলে । ফুলের গন্ধে ভরে আছে। মিউজিক্যাল ফাউন্টেইনের আবিষ্ট জলে রঙিন হুল্লোড় উপচে পড়ছে । পৌষের হাওয়ায় দৌড়ে বেড়ায় আনন্দ ।জলকণা । লো-ভলিউমে সন্তুর ,ভৈরবীতে ।

এদিক-ওদিক বাচ্চাদেররা ছুটোছুটি । কিরণ আন্টিকে দেখে গিফট দেয় । কিরণের কোল ভরে ওঠে । ক্যাডবেরি । ব্যাগাটেলি । ফুলের বোকে। লেগো । ওরা এক্সাইটেড।

৩৩

মোটামুটি কাজ শেষ। এখন সূর্য এলেই হয়। ধুতি পড়ে সূর্য হেঁটে আসছিল । হইহই করে দৌড়ে এল মেয়েরা । 'নো । নট লাইক দ্যাট দা রিচুয়ালস পালকিতে চড়ে আসতে '

৩৪

ছেলেরাই চৌহদ্দি ঘুরিয়ে পালকি থামায়। কিরণের পাশে । সূর্য চেয়ারে এসে বসে । সবাই উৎসুক । গোল হয়ে বসে দাঁড়িয়ে ।

৩৫

সুনন্দা বলল, 'হাই কিরণ! স্মাইল । একটু পরেই মালাবদল ।

আচার্য মশাই বললেন, 'বেশি সময় নেই। কুইক। লগ্ন ছেড়ে যাবে'

৩৬

দীর্ঘ প্রেমপর্ব ছিল । অবশেষে মধুরেণ সমাপয়েৎ হতে চলেছে বিয়ের মধ্যে । এতে আশ্চর্যের কিছু নেই । বুড়ো হলে প্রেম হবে না। মন থেকে প্রেম মরে যাবে এটা ভাবার কোন কারন নেই। শুরু হয়েছিল কুড়ি-বছর আগে ।

৩৭

সূর্য লোহিয়ার অসুস্থ স্ত্রীকে তখন দেখাশুনো করতেন কিরণ । সূর্য কখনও জানতেও পারেননি । কিরণের নীরব মুগ্ধতা। কিরণ যে নিজের জীবনে অসুখী ছিল, তা নয় । স্বামী, পুত্র নাতি নাতনি ভরা সংসার। অনেককাল আগে একবার নাতিনাতনি বৌমার নিয়ে ছেলে এসেছিল । সে বছর হয়েছিল প্রবল সুনামী । তারপর আর আসতে পারে নি । কিরণের হ্যাজব্যান্ড ছিলেন বিত্তবান পোশাক ব্যবসায়ী । কিরণ স্টেট হাসপাতালের নার্স। পরে ভিআরএস নেন ।

৩৮

সূর্যের স্ত্রী, পূর্ণিমা । কলেজে পড়াতেন । এক বৃষ্টিতে গাড়ি দুর্ঘটনা। মারাত্মক আহত হয়ে অর্ধমৃত ছিলেন কুড়ি বছর ।

সেদিন দেশে আছড়ে পড়েছিল অভাবনীয় সুনামী । চারদিকে সব লন্ডভন্ড । হয়ত এমনই ছিল অলক্ষ্যে বিধাতার নির্ঘন্ট । কিরণ চাকরী ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন স্বেচ্ছাসেবী হয়ে। ঐ সুনামীর প্রবল ঢেউই হয়ত ছিল প্রজাপতি ব্রহ্মার নান্দীমুখ । যোগাযোগ হল সূর্যের সঙ্গে ।

৩৯

পূর্ণিমা মারা গেলে সূর্য এখানে আসেন। কিরণ দেশে চলে যায়। কিরণ জানতেও পারেনি । সূর্য কোথায় গেছেন ।

৪০

কিরণের হাজব্যান্ড মারা যাওয়ার পর ছেলেই বিদেশ থেকে যোগাযোগ করে এখানে ।এখানে আসার

পর ভিডিও কলে আইন কানুনের যাবতীয় ফর্মালিটিজ শেষ করে ।

৪১

এখানে এসে আবার দেখা হয়ে যায়। মিস্টার লোহিয়া মানে সূর্যের সঙ্গে। একেবারেই আকস্মিক। সূর্যেরও নিশ্চয়ই কোথাও একটা সফট কর্নার ছিল । তবে একে অপরের কাছে কখনই একথা স্বীকার করেনি

দিগন্তের আকাশ যেমন মিশে যায় সমুদ্রে তেমনই নিঃশব্দ । অনুচ্চারিত, অপ্রকাশিত রয়ে গেছিল ভূখণ্ডের মায়ায় ছুটে আশা দিগন্ত। অথচ এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎ নিতান্তই আকস্মিক ।

এবার সূর্য দীপ্ত, উদ্ভাসিত কিরণ। তবে এখানকার আবাসিকেরাও জেনেছেন আরও পরে।

৪২

আচার্য মশাইয়ের ঐ কথাটায় ঘুরপাক খেয়ে ভৈরবীর সুরে মিশে যায়। শীতের আকাশ । ঝকঝক করছে অসংখ্য তারা ।

কিরণের প্রসারিত হাত ।হুইল চেয়ারের হাতলে আজ অপেক্ষমাণ ।কুয়াশায় ভিজে নরম। সূর্য হাত পেলব শালের সুতোর নকশায় মুখরিত অভিন্দন মাথায় নিয়ে প্রসারিত। কিরণের উষ্ণমুঠোয় ভালবাসার মৌন শিশির ।ছেয়ে যায় কিরণ ।এই জীবন পুনরায় দুই চমকমিতে পূর্ণাবয়ব। দুটি নৃত্যরত স্ফটিকজল সাক্ষ্য দিয়ে।

৪৩

পটাপট ছবি তুলছে শিমরান। আচার্যমশাই টুকিটাকি গুছিয়ে নিচ্ছেন। বিয়ে শুরু হল।

৪৪

যজ্ঞের শিখা জ্বলে ওঠে । ঘি,বেল কাঠের উষ্ণ হলুদ-লালে চমৎকার সেজেছেন বিধাতা অগ্নি ।

আচার্য মশাই মন্ত্র পড়ছেন ...

'সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ।

সৎ মাতরিশ্ব সং ধাতা সমু দ্রেষ্ট্রী দধাতু নৌ।।

কিরণের কানে ফিসফিস করছে সূর্য । দেবতাগণ আমাদের হৃদয়কে মিলিত করে দিন। বায়ু, ধাতা,বাগ দেবী আমাদের পরস্পর সংযুক্ত করুন...

পুনর্রজা নিবর্তস্ব পুনরম ইষায়ূষা।

পুনর্নঃ সংযুক্ত পাহ্যংহসঃ।।

...হে অগ্নি তুমি বল ও আয়ু সহ আবার আমাদের কাছে এস...'

৪৫

সূর্য মনে মনে দ্রুত উচ্চারণ করে:

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্।

নায়ং ভূত্বা ভবিতাবা ন ভূয়: ।।

অজো নিত্যঃ শ্বাশতোহয়ং পুরানো ।

৪৬

এখন মালাবদল। সূর্য আঁকড়ে ধরে কিরণকে । মালা পড়ায় । উলু শঙ্খ । ঘিয়ের গন্ধে বিভোর ফুলের পাপড়ি । উড়ে আসে...

সবাই গোল হয়ে আছে । এক অভিনব মুহূর্ত। চিৎকার করে,

'ওয়ানস এগেইন । নিজেদের গলার মালা তুলে পরস্পরকে পড়িয়ে দিচ্ছে ওরা। কিরণের কানে বিড়বিড় করে সূর্য:কিরণ ইউ চ্যান্ট ..কিরণ ...

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। ।

যজ্ঞ ঘিরে শুভবিবাহে সশরীরে সহস্র ঋত্বিক । মন্ত্রোচারণে পবিত্র আশীর্বচন ...

৪৭

বলো.... কিরণ ... বলো....

...ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে...

কিরণের শরীর শিরশির করে ...

৪৮

'হাই সূর্য! নো মাই ডিয়ার ।কাম অন। নো, ইউ কান্ট'

ঢলে পড়ছে সূর্য ।কিরণের কোলে...

৪৯

কিরণ শান্ত । তবুও কী এক দুর্নিবার আশায় সূর্যের কব্জিতে আঙুল রাখে। দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত কিরণের আঙুলও কাঁপছে...নাহ ভুল নেই!

শিমরান হতচকিত । বিহ্বল সুনন্দা, নিশা। উদ্ভ্রান্ত চু-কিংকিং.ঝাঁপিয়ে আসছে।একসঙ্গে ।দুরন্ত প্রত্যাশায় ।

৫০

সলজ্জিত কিরণ। স্মিত হাসি নিয়ে স্তব্ধ নিথর !

হীরক সেনগুপ্ত, সমাজবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা।কোলকতা বিশ্ববিদ্যালয়। পেশা শিক্ষকতা। অবসর বিনোদন :ফটোগ্রাফি, ভ্রমণ, ডুডলস ,বইপড়া ,হাতের লেখা

ধ্বংসের খেলা

অনন্যা দাশ

খুব ভোরেই রওনা হলাম আমরা। সূর্য তখন সবে উঠছে। চারিদিকে পাখিদের কলরব। আকাশে বাতাসে দিগন্ত জুড়ে রক্তিম আভা। আহা কী অপরূপ দৃশ্য। গাড়ি চালাতে চালাতে সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে মন প্রাণ সব জুড়িয়ে যাচ্ছিল আমার। আমার পাশে বসা দর্শিতা একটুখানি দেখেই ঢুলতে শুরু করল। জিয়াও পিছনে নিজের কারসিটে বসে বসেই ঘুমোচ্ছে। ওর ফর্সা গালে টোল পড়েছে। এত সকালে ওঠার অভ্যেস তো নেই মা মেয়ের। আমার জোর করাতে দুজনে রাজি হয়েছে বটে কিন্তু জেগে থাকতে পারছে না। অনেকদিন ধরেই এই রোডট্রিপটা করার ইচ্ছে ছিল আমার। দর্শিতা আর জিয়াকে আমার বড়ো হয়ে ওঠার জায়গাটা দেখাবো! গতকাল রাতে আমরা এখানে এসে পৌঁছেছি। তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল তাই একটা হোটেলে ছিলাম। আজ তাই আর তর সইছে না বলে ভোরবেলা বেরিয়ে পড়েছি।

বারো বছর বয়সে যখন বাবা-মার হাত ধরে এই মার্কিন মুলুকে এসেছিলাম তখন মনে খুব ভয় ছিল। চেনা পৃথিবীকে ছেড়ে অচেনা জগতে আসার ভয়। ধীরে ধীরে এই দেশটাকেও ভালোবাসতে শিখে গিয়েছি আমি। তাও সেই প্রথম দিনগুলোর স্মৃতি মাঝে মাঝেই মনকে নাড়া দেয়। সেই সেদিনের ভিতু ছেলে আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে সেটা ভাবলেও কেমন লাগে। জিয়াকে আমি আমার ছোটবেলার অনেক গল্প করেছি, দর্শিতাকেও। কী ভাবে ধুমসো ছেলেদের হাতে বুলি হয়েছিলাম, তারপর রুখে দাঁড়াতে শিখে নিয়েছিলাম। হোটেলে কাজ করা, স্কুলে যাওয়া ট্রেনে চড়ে সব কিছুই ওদের দেখাতে ইচ্ছে করে। বিশেষ করে জিয়াকে। মেয়েটা এত কষ্ট পাচ্ছে এই টুকুনি বয়সেই। দর্শিতার সঙ্গে আমার আপাতত একটা ঠান্ডা লড়াই মতন চলছে তাই ওর মনে কী আছে বুঝতে পারছি না ঠিক। একবার মনে হয়েছিল ও বুঝিবা এই রোড ট্রিপটাতে যেতেই চাইবে না, মানা করে দেবে কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে ও রাজি হয়ে গেল!

দর্শিতা আসলে বেশ বড়োলোক বাড়ির মেয়ে। প্রেম করেই বিয়ে করেছিলাম আমি ওকে। কলেজে পড়ার সময় প্রেম। ওর মা-বাবার অবশ্য প্রবল আপত্তি ছিল আমাদের বিয়েতে। তার প্রধান কারণ হল ওরা জৈন আর আমি মাছ মাংস খাওয়া বাঙালি! তবে তখন আমাদের চোখে অন্য নেশা। আমার মা-বাবা ততদিনে গত হয়েছেন আর রাজস্থানে বসে থাকা দর্শিতার মা বাবাকে তোয়াক্কা করার কোন কারণ দেখতে পাইনি আমরা।

এদেশেই বন্ধুদের সাহায্যে বিয়েটা সেরে নিয়েছিলাম। মন্দিরে বিয়ে তারপর বন্ধুদের জন্যে একটা পার্টি। দর্শিতা অবশ্য বিয়েতে পরার জামাকাপড় সব রাজস্থান থেকেই আনিয়েছিল এক বন্ধুকে দিয়ে। ভারি সুন্দর লাগছিল ওকে, বেশ পদ্মাবতীর মতন! মুখে হাসি চোখে জল। বিয়েতে মা-বাবার না আসাটা ও কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। জিয়ার জন্মের পর অবশ্য ওর মা বাবা গলে গিয়েছিলেন। তখন এসে আমাদের সঙ্গে ছিলেনও কয়েকদিন। তবে খুবই গোঁড়া মানসিকতার মানুষজন। ওঁদের রান্নার জন্যে নতুন বাসনপত্র কিনতে হয়েছিল। আমাকে বিশ্বাস নেই, কোন পাত্রে মাংস রান্না করে খেয়েছি তার ঠিক নেই। যাই হোক, দর্শিতার তখন কিছুটা

সুবিধা হয়েছিল, ওর মা রান্না টান্না কিছুটা করে দিতেন নিরামিষই হোক আর যাই হোক। জিয়ার এক মাস বয়স হওয়া পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আমাকে কোন রকমে সহ্য করতেন আর কী!

একবছর পর্যন্ত ঠিক ছিল জিয়া তারপর ওর ওই সমস্যাটা দেখা দিল। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে প্রচুর টেস্ট মেস্ট করেতে দিলেন। সেই সবের টেস্টের রেজাল্ট দেখে দাঁত ভাঙ্গা কী সব রোগের নাম বাতলে দিলেন। সেই সব অসুখ হয়েছে নাকি ওই টুকুনি পুঁচকে মেয়ের! জিয়ার নার্ভ দুর্বল, মাংসপেশি দুর্বল আরও কী কী সব সমস্যা আছে এবং এই রকম শিশুরা নাকি বছর কুড়ির বেশি বাঁচে না, তার আগেও...

খবরটা শুনে আমাদের মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়ল। সেই মুহূর্তেই কিনা জানি না তবে সেইখান থেকে আমি আর দর্শিতাও বদলে গেলাম। দর্শিতার আর কোনও কিছুতে উৎসাহ নেই তেমন। আগে বাড়ি ঘরদোর সুন্দর করে সাজিয়ে রাখত, নানা রকম রান্নাটান্না করত ইউ টিউব থেকে দেখে।নিজেও বেশ সেজেগুজে থাকত, আর এখন ওকে দেখলে মনে যেন ওর বয়স পঞ্চাশ! জিয়া এখনও বুকের দুধ খায়। দর্শিতার লজ্জা চলে গেছে। যেখানে সেখানে জামাটামা তুলে দুধ খাওয়াতে থাকে। সেদিন তাপস আর সোমা বেড়াতে এসেছিল তাদের সামনেই জিয়াকে খাওয়াতে শুরু করে দিল সে। তাপস তো আর যেন চোখ ফেরাতে পারছিল না। সোমা দেখতে পেয়ে প্রচন্ড রেগে গিয়ে তাপসকে টেনে নিয়ে চলে গেল। ওরা আর আমাদের বাড়িতে কোনদিন আসবে বলে মনে হয় না। দর্শিতার অবশ্য যেন কোন হুঁশ নেই। ওই যে বললাম সব কিছুতেই উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। আমাদের মস্ত মাস্টার বেডরুমটাতে আমি একাই শুই। দর্শিতা জিয়ার সঙ্গে ওর ঘরে শোয়।

বিয়ের পরের আনন্দঘন দিনগুলোর কথা মনে পড়ে মাঝে মাঝে। কত জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলাম আমরা। আর এখন বেড়াতে যাওয়া তো দূরের কথা ঠিক করে কথাই হয় আমাদের মধ্যে। সেই ভেবেই এই রোড ট্রিপটার পরিকল্পনা করেছিলাম আমি।

অবশ্য শুধু দর্শিতাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমি নিজেও অনেকটাই বদলে গেছি। নাহ মদ আমি খাই না। নিশিদ্ধ পল্লী টল্লীতেও যাওয়ার আগ্রহ নেই কিন্তু আমাদের বাড়ি থেকে মিনিট কুড়ির দূরত্বে যে ক্যাসিনোটা আছে সেটাতে যেতে বেশ লাগে। ঘোড়ার দৌড় হয় সেখানে চোখের সামনে। দারুণ লাগে তেজি ঘোড়াগুলোকে ছুটতে দেখে! আর বাজি লাগানো ঘড়াটা যদি জিতে যায় তাহলে তো কথাই নেই! একবার দু'হাজার ডলার পেয়েছিলাম। তারপর থেকে প্রায়ই যাই। হেরেই যাই বেশির ভাগ সময় কিন্তু তাও ওই সময়টুকু রক্তে যে টানটান উত্তেজনা অনুভব করি সেটা আর কোন কিছুতে পাই না! চিৎকার করে গলা ফাটাই। আনন্দে ডুবে যাই।

ভালই চলছিল তারপর একদিন হঠাৎ অনুভব করলাম যে অর্থের টান পড়ছে! জিয়াকে নিয়ে বিস্তর খরচা। একবার যদি একটা তেজি ঘোড়ার ওপর ভালো দাঁওটা লাগাতে পারি তাহলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে কিন্তু তার আগে পর্যন্ত আমি ফকির! যে বাড়িটাতে আমরা থাকি সেটা মন্দ নয় কিন্তু মর্টগেজ আছে সেটার ওপর। মানে সেটাকে ব্যাঙ্কের সম্পত্তি বলা যেতে পারে। গাড়ীটাও ইন্সটলমেন্টে কেনা। তার ওপর জিয়ার হাসপাতালে বিল আছে, মিসেস রবসনের মাইনে আছে। ও মিসেস রবসনের কথা তো বলাই হয়নি। উনি এককালে নার্স ছিলেন, এখন রিটায়ার করেছেন। উনি জিয়াকে সারাদিন দেখেন, দর্শিতা একা পেরে ওঠে না

তাই। জিয়া ওনাকে খুব ভালোবাসে। তা অর্থের টান পড়তে আমি একটু ঘাবড়েই গেলাম। কী করি কী করি সাত পাঁচ ভেবে অফিস থেকেই কিছু ডলার ধার নিয়েছিলাম। মানে ঠিক ধার বলা চলে না। একটা অ্যাকাউন্ট থেকে চুপি চুপি সরিয়েছিলাম। ফেরত দিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনাই ছিল কিন্তু তেজি ঘোড়াটা যেতার আগেই কী ভাবে জানি অ্যাকাউন্টেন্ট মার্কের চোখে পড়ে গেল আমার ছোট্ট কারচুপিটা। এমন ধুরন্ধর লোকটা যে কী করে জানি সব জেনে ফেলল। তারপর থেকেই অফিসে ফিসফাস! কী জ্বালা! ফেরত দিয়ে দেব তো! অত হ্যাঙ্গামা করার কী আছে? সেদিন বিরক্ত হয়ে বাড়ি ফিরে এলাম তাড়াতাড়ি। মিসেস রবসন তখন জিয়াকে নিয়ে পার্কে গেছেন। ওই সময়টাতেই যান। ওনার সব কিছু একেবারে ঘড়ি ধরে!

ড্রাইভওয়েতে দেখলাম প্লাম্বার জ্যাকের গাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে! আবার কী বিগড়োল রে বাবা? রান্নাঘরের একটা পাইপ মনে হয় লিক করছিল তাই দর্শিতা বলেছিল ওকে ডাকবে। আজকাল আমাদের বাড়ির পাইপগুলো কেমন যেন ঝুরঝুরে হয়ে গেছে প্রায়ই খারাপ হয়, লিক করে।

আমার কী মনে হল আমি বাড়ি পিছন দিকটায় গেলাম। এদিকটায় বেশ একটু জঙ্গল মতন। বড়ো বড়ো গাছ আছে। পাশের বাড়ি থেকে দেখতে পাওয়া যায় না কিছু। কিন্তু আমাদের বাগান থেকে আমাদের বেডরুমের ভিতরটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। আমি তাই বাইরে থেকে উঁকি দিলাম। দর্শিতা দেখলাম জ্যাকের আলিঙ্গনে আবদ্ধ। এইরকমটাই আন্দাজ করেছিলাম আমি। নাহলে কী আর এত ঘন ঘন পাইপ খারাপ হয়! আমি আর ঘরে ঢুকিনি। সোজা রেসকোর্সে চলে গিয়েছিলাম। টিল ইটারনিটির দৌড়বার কথা সেদিন। একেবারে চাবুক ঘোড়া। যা থাকে কপালে বলে লাগিয়ে দিলাম সর্বস্ব! টিল ইটারনিটি জিতছিলই কিন্তু হঠাৎ ব্যাটা স্প্রিং ব্লসম কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে নাকটা বাড়িয়ে দিয়ে জিতে গেল! তবে এখন আর এই সব ছোটখাটো ব্যাপার আমাকে ছুঁতে পারে না! আমি তখন ঠিক করলাম আমার পরিবারটাকে এক সঙ্গে রাখতে হবে আমাকে। আমি দর্শিতা আর জিয়া...আমরা তো ফ্যামিলি! ফ্যামিলির তো এক সঙ্গেই থাকা উচিত! তখনই ঠিক করে ফেললাম এই রোডট্রিপটাতে যাব!

আমি গাড়িটাকে খ্যাচ করে ব্রেক করতে দর্শিতা চমকে উঠে পড়ল। আমি যেন কিছুই হয়নি এমন করে বললাম, "এইখানে মিসেস সিম্পসনদের একতলা বাড়িটা ছিল আর এখন দেখো...ছ'তলা বাড়ি হয়ে গেছে! ওই যে ওই বাড়িটা দেখছ ওখানে মিস্টার মিসেস লিন থাকতেন। ওনাদের বাড়ির পিছনের বাগানে আঙুর গাছ ছিল। সেই সবুজের এখন আর কোন চিহ্নমাত্র নেই! ওই মোড়ে আমাদের বাস্কেটবল খেলার কোর্টটা ছিল। সেখানেও বাড়ি হয়ে গেছে। ছেলেপিলেগুলো এখন কোথায় খেলে কে জানে! কংক্রিটের জঙ্গল হয়ে গেছে, যেন হৃদয়হীন একটা শহর! কেমন যেন অন্যরকম লাগছে পাড়াটাকে! কোন কিছুই এক রকম থাকে না, তাই না? সব কিছুই পালটে যায় সময়ের সাথে সাথে!"

সত্যি কুড়ি বছরে কত কী বদলে গেছে! আমি কল্পনাও করতে পারিনি। আমার ছোটবেলাকার সেই জায়গা আজ আমার কাছে বড়ো অচেনা। অবশ্য আমার বউ, মেয়ে কাউকেই কী আমি আর চিনি? সব থেকে বড়ো কথা নিজেকেই তো আমি চিনতে পারি না আজকাল!

শহর থেকে বেরিয়ে অন্য একটা চেনা রাস্তা ধরলাম আমি। দর্শিতা আবার ঢুলছিল। আমি প্রচন্ড জোরে হেয়ারপিন বাঁকটা নিতে ধড়মড় করে উঠে বসল। খুব জোরে চালাচ্ছি আমি গাড়িটাকে, একটু যেন বেশি জোরেই। এই রাস্তায় যা স্পিড বলা আছে তার থেকে তিনগুণ বেশি জোরে! বাঁকগুলোকে নিচ্ছি ভয়ঙ্কর ভাবে...এর পর কী হবে আমি জানি। দর্শিতাও জানে, ওর চোখে আমি প্রবল ভয় দেখলাম। তাও ভালো জিয়াটা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। একটু পরেই আমাদের গাড়ি রাস্তা ছেড়ে শূন্যে পাক খেয়ে উড়ে যাবে, হয়তো আছড়ে পড়বে অতল কোন এক খাদে...তাতে কী? আমি আমার পরিবারের সঙ্গেই তো রয়েছি তাই আমার কোন ভয় নেই! আমার স্বপ্নের রোডট্রিপ যে এটা! আমাদের যাত্রা শুভ না হয়ে যায় না...

অনন্যা দাশ পেনসিলভেনিয়া রাজ্যের হার্শি-তে বাস করেন এবং পেন স্টেট **ইউনিভার্সিটিতে** কর্মরত। শিশু-কিশোরদের জন্যে লেখা গল্প এবং উপন্যাস কলকাতার প্রায় সব নামকরা পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

যুদ্ধের সেকাল একাল

অর্ণব দাশগুপ্ত

"শতরঞ্জ কে খিলাড়ি" মনে আছে? মুন্সী প্রেমচাঁদের গল্প অবলম্বনে সত্যজিৎ রায়ের ছবি ? ছবিতে আমরা দেখেছিলাম ভারতীয় রাজ্য অবধ, যার রাজধানী ছিল লখনৌ, তার নবাব ওয়াজিদ আলি শাহকে কিভাবে ব্রিটিশ উৎখাত করলো। আর পাশাপাশি দু'জন অভিজাত নাগরিকের গল্প যারা দাবা-র একটা পুরোনো রূপ শতরঞ্জের নেশায় মশগুল। ছবিতে সত্যজিৎ রায় নবাবকে (আমজাদ খান) এক অমিতব্যয়ী কিন্তু সহানুভূতিশীল ব্যক্তিত্ব হিসাবে চিত্রিত করেছেন। নবাব একজন শিল্পী এবং কবি, বৈদেশিক আক্রমণকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তার ছিল না এবং তাঁর সিংহাসনের জন্য ব্রিটিশদের দাবির কার্যকরভাবে বিরোধিতা করতে পারেন নি। এই বৃহত্তর নাটকের সমান্তরাল হ'ল এই রাজ্যের দুই ধনী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মির্জা সাজ্জাদ আলী এবং মীর রওশন আলীর ব্যক্তিগত (এবং হাস্যকর) গল্প। অবিচ্ছেদ্য দুই বন্ধু শতরঞ্জ (দাবা) খেলায় নেশাগ্রস্ত এবং একরকম মোহাচ্ছন্ন। দাবার নেশায় অভিভূত দুই বন্ধু বাস্তব থেকে এতটাই বিচ্ছিন্ন যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে প্রতিরোধ করার কাজে নবাব কে কোনোরকম সাহায্য করতে ব্যর্থ হন। দুই বন্ধু তাদের পরিবার এবং সমস্ত রাজকার্যের দায়িত্ব ত্যাগ করে লখনৌ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন ছোট্ট একটা গ্রামে যেখানে নিশ্চিন্তে দাবা খেলা যায়। ছবির মূল থিমটির বার্তা হলো এই যে ভারতের শাসক শ্রেণির বিচ্ছিন্নতা অল্প সংখ্যক ব্রিটিশ কর্মকর্তা ও সৈন্যকে কোনোরকম বিরোধিতা ছাড়াই অবধ রাজ্যটিকে দখল করতে সহায়তা করেছিল।

উপরের ঘটনাটি ঊনবিংশ শতকের। ওয়াজিদ আলী শাহ রাজ্যচ্যুত হন ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারি। বাকি জীবন কলকাতার মেটিয়াবুরুজে উদারচেতা ব্রিটিশের দেওয়া বড়োরকম পেনশন (গরু মেরে জুতা দান) ভোগ করেছেন এবং ৬৫ বছর বয়সে কলকাতাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কি মনে হয়? একালে ভারতবর্ষের শাসক শ্রেণী অনেক ভালো? ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে না তো? একটা ব্যাপারে একটু স্বস্তি আছে (যদিও অঘটন ঘটতেই পারে) - এটা আশা করা যায় যে পারমাণবিক অস্ত্র সমৃদ্ধ দেশগুলোর মধ্যে - যেমন ভারত, চীন, পাকিস্তান - অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ হবে না। যুদ্ধ যেটা শুরু হয়ে গেছে এবং চলতে থাকবে - তা হলো একরকম টেক ওয়ার অর্থাৎ প্রযুক্তিগত প্রতিযোগিতা আর তার বাণিজ্য নিয়ে যুদ্ধ। আমরা খুব খুশি হই যখন শুনি বৈদেশিক বিনিয়োগ আসছে ভারতবর্ষে - বহুজাতিক সংস্থা তাদের ব্রাঞ্চ খুলছে, মানুষের কর্মসংস্থান হচ্ছে ইত্যাদি। সত্যি যদি সংস্থা বহুজাতিক হয় এবং শুধু ব্যবসাই উদ্দেশ্য হয় তাহলে চিন্তার কারণ খুব একটা নেই। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও ব্যবসা করতেই এসেছিলো। পরিণাম সকলের জানা।

যে যুদ্ধটি ইদানীং সংঘটিত হচ্ছে তা দুটি দেশের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ নয়। একালের এই নতুন যুদ্ধ হলো প্রযুক্তি সংস্থাগুলির মধ্যে যুদ্ধ এবং বিজয়ী বলা যায় সেই দেশটিকে যেটি শীর্ষস্থানীয় সংস্থাগুলির মালিক বা সহজ কথায় যারা লভ্যাংশের সিংহভাগ পায়। এখন প্রতিটি দেশেরই, আমেরিকা হোক আর ভারত হোক, এই যুদ্ধের জন্য যোদ্ধা দরকার। সীমান্ত বরাবর দুটি দেশের যুদ্ধে যোদ্ধারা লড়াই করে সীমানা রক্ষা করে। তাদের দেশের নির্দিষ্ট সীমারেখা বিদেশী শক্তিকে যোদ্ধারা কিছুতেই অতিক্রম করতে দেবে না - দরকারে প্রাণ দেবে। এইরকম যুদ্ধের যারা যোদ্ধা - তাদের মনে কর্তব্যপরায়ণতার পাশাপাশি একটা আবেগ বা দেশপ্রেম কাজ করে। কিন্তু কোনও শিল্পসংস্থার অগ্রগতির জন্য কি কর্মচারীর মনে আবেগ বা ভালোবাসা কাজ করে - যা দুটি দেশের যুদ্ধে বা খেলাধুলায় আমরা দেখি? আধুনিক যুদ্ধে সেই দেশপ্রেমের বিকল্প কি হতে পারে?

কোম্পানীপ্রেম? কোনো সংস্থায় যারা কাজ করেন অনেকদিন তাঁদের নিজের কোম্পানি সম্পর্কে আনুগত্য বা আবেগ একেবারে থাকেনা বলবো না কিন্তু একজন কর্মীর মধ্যে তা তৈরি হতে এক বা দুই দশক লেগে যেতে পারে যা এক দেশ ও আর এক দেশের যুদ্ধে বা খেলাধুলার প্রতিযোগিতায় আসে স্বাভাবিক ভাবে। ততদিন একজন কর্মীর চাকরি থাকে কিনা তারই স্থিরতা নেই। চাকুরীস্থলের সঙ্গে আবেগপ্রবণ যোগ কিছুটা হয়তো ঘটে শুধু সেই কর্মীদের - যারা কোম্পানিটিকে নিজে হাতে গড়েছেন বা কাজ করছেন বহু বছর।

এখন প্রশ্ন হলো কি উপায়ে দেশগুলি এই নতুন রকমের যুদ্ধে জয়ী হবে। প্রথমতঃ দেশগুলিকে একালের যোদ্ধা বা ট্যালেন্টেড ওয়ার্কফোর্স তৈরি করতে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার জন্য বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। দ্বিতীয়তঃ চোখ কান খোলা রেখে জানতে হবে প্রতিবেশী দেশগুলি কি উপায়ে বাকি দুনিয়ার ওপর তাদের আধিপত্য বিস্তার করছে - শতরঞ্জ খেলায় মত্ত না হয়ে।

এ পর্যন্ত প্রতিবেশী চীন কি করেছে দেখা যাক। প্রথমে স্বল্পমূল্যে তাদের শ্রম বিক্রয় করেছে পশ্চিমের দেশগুলিকে । উন্নত দেশগুলি ম্যানুফ্যাকচারিং-এ চীনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে সত্তরের দশক থেকে। ম্যানুফ্যাকচারিং করার পাশাপাশি চীনের কর্মীরা বুঝে নিয়েছেন পণ্য তৈরির পশ্চাতে অন্তর্নিহিত প্রযুক্তি এবং তাদের কপিক্যাট বলুন আর যাই বলুন পাল্লা দিয়ে চীন এগিয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পশ্চিমের দেশগুলির সমকক্ষ হয়ে ওঠার ব্যাপারে। ঠিক কিভাবে (সব নীতি স্বচ্ছ নয়) চীন অর্থনৈতিক ও সামগ্রিক উন্নতি করলো তার মধ্যে না গিয়েও এটুকু বলা যায় যে শুধু ডিক্টেটরশিপ দেশটিকে এতটা সফল করেনি। এর জন্য শিক্ষার সুব্যবস্থা এবং দুর্নীতিহীন না হলেও অপেক্ষাকৃত কম দুর্নীতিপূর্ণ একটি সমাজব্যবস্থা প্রয়োজন - যার জন্য কমিউনিস্ট না হলেও চলে।

একটা দেশ শক্তিশালী হওয়ার পর তার পরবর্তী পদক্ষেপ কি হতে পারে? আগের দিনে হলে বলা যেত যুদ্ধ করে রাজ্যবিস্তার করা। একালেও তাই - তবে একটু অন্যভাবে। অতীতে শক্তিশালী জাতিগুলি তাদের সামরিক শক্তি ব্যবহার করে অনুন্নত বা দুর্বল জাতিগুলির উপর কর্তৃত্ব করতো। সাম্প্রতিক দিনগুলিতে, সামরিক শক্তির পরিবর্তে অর্থনৈতিক শক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। এর একটা ভালো দিক হলো রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এড়ানো সম্ভব এবং যে দেশ অনুন্নত সেও তার নাগরিকদের শ্রম স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে জনসাধারণের কর্মসংস্থান করতে পারে।

কি করছে প্রতিবেশী চীন ? আমেরিকা সত্তরের দশক থেকে চীনের শ্রমজীবীদের ব্যবহার করেছে। আজ চীন উন্নত এবং ক্ষমতাবান। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পথে না হেটেও তারা এক নতুন কৌশলে দুনিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করছে। কিছু বছর আগে চীন Belt and Road Initiative বা BRI নামে এক বৃহৎ কর্মকাণ্ড শুরু করে। 2013 সালে ইন্দোনেশিয়া এবং কাজাখস্তানের সরকারী সফরের সময় শি জিনপিংএই কৌশলটি ঘোষণা করেছিলেন। প্রায় 70 টি দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থায় বিনিয়োগের জন্য অবকাঠামো (infrastructure) উন্নয়নের এই কৌশলটি চীনের বৈদেশিক নীতির কেন্দ্রস্থল হিসাবে বিবেচিত হয়। "বেল্ট" বলতে রাস্তা ও রেল পরিবহনের ওভারল্যান্ডের রুটগুলিকে বোঝায়, যাকে "সিল্ক রোড ইকোনমিক বেল্ট" বলা হয়; যদিও "রোড" বলতে সমুদ্রের রুট বা একবিংশ শতাব্দীর মেরিটাইম সিল্ক রোড বোঝায়। উদ্যোগটি 2017 সালে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন এর সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। চীন সরকার এই উদ্যোগকে "আঞ্চলিক যোগাযোগ উন্নত করার এবং একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আলিঙ্গন করার আহ্বান" হিসাবে অভিহিত করেছে। কিছু পর্যবেক্ষক এটিকে চীন-কেন্দ্রিক বৈশ্বিক (Global) বাণিজ্য নেটওয়ার্কের মাধ্যমে চীনের বিশ্ব আধিপত্যের পরিকল্পনা হিসাবে দেখছেন।[1] প্রকল্পটির একটি লক্ষ্য নির্ধারণের তারিখ রয়েছে 2049, যা গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের 100 তম বার্ষিকীর সাথে মিলে যায়।

কেন চীন এই কৌশল টি বেছে নিল ? এর কারণ হয়তো অনেক - তবে প্রধান চারটি হলো এইরকম: চীনের বিনিয়োগ করার অর্থ আছে, অনেক চৈনিক মানুষকে চাকরির সংস্থান করে দেবার দায়িত্ব আছে, আন্তর্জাতিক স্তরে বন্ধু (বা ঋণী) দেশ জোগাড় করার উদ্দেশ্য আছে আর সর্বোপরি আছে দুনিয়ার উপর দাদাগিরি করার বাসনা।

পররাষ্ট্রনীতি থিংক ট্যাঙ্কের একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদন (February, 2020) 'গেটওয়ে হাউস: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অন গ্লোবাল রিলেশনস' অনুমান করেছে যে চীনা প্রযুক্তি বিনিয়োগকারীরা ভারতীয় স্টার্টআপগুলিতে আনুমানিক চার বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছেন। ভারতীয় সংস্থাগুলির নাম গুগল করলে পাবেন বা রেফারেন্স [2] দেখতে পারেন।

সাম্প্রতিককালে অন্যান্য দেশে চীনের কয়েকটি বিনিয়োগ এইরকম:

শ্রীলঙ্কায় হাম্বানটোটা বন্দর তৈরি করায় সাহায্য করেছে চায়না মার্চেন্টস পোর্ট হোল্ডিং কোম্পানি (CMPort)। ঋণ শোধের সম্ভাবনা ক্ষীণ - তাই বন্দরের ৭০ শতাংশ CMPort কে লিজ দিয়েছে শ্রীলঙ্কা। [3]

অ্যাঙ্গোলায় চীনের উপস্থিতি আফ্রিকান দেশগুলির সাথে চীনের তেলের কারণে সম্পর্ক স্থাপনের একটি আদর্শ উদাহরণ। এ যাবত যেভাবে চীন ও অ্যাঙ্গোলার দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা চলছে, তাতে চীন অ্যাঙ্গোলার তেল খাতে বৃহত্তর অংশীদারিত্ব অব্যাহত রাখবে, এবং উভয় দেশই বর্তমানে তেলের বিনিময়ে পরিকাঠামো (Oil for Infrastructure) ব্যবসায়িক নীতি কে সমর্থন করবে বলে মনে হয়। । [4] ইউটিউবে একটি প্রতিবেদন অবশ্য বলছে পরিকাঠামো হিসাবে তেলের বিনিময়ে অ্যাঙ্গোলায় চীন চার লেনের হাইওয়ে এবং অনেক বড় বড় এপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স তৈরি করে - যে হাইওয়েতে কোনো গাড়ি চলেনা আর বাড়িগুলিতেও কেউ থাকেনা কারণ অ্যাঙ্গোলার বাসিন্দারা $120K দিয়ে এপার্টমেন্ট কেনার ক্ষমতা রাখেনা। এই টাউন গুলিকে অ্যাঙ্গোলার গোস্ট টাউন বলা হয়। [5]

পাকিস্তান চীনের কাছে এপর্যন্ত 62 বিলিয়ন ডলারের লগ্নি পেয়েছে। কিছু উন্নয়ন হয়েছে তবে পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের জীবনে ওই উন্নয়নের ফল কিছু দেখা যায় না - তার কারণ যদিও চীন নয় - তার কারণ পাকিস্তানের দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিকের দল। 62 বিলিয়ন লগ্নির পরে একটা ব্যাপার পাকিস্তানের কাছে এখন পরিষ্কার - চীনের সংস্থাগুলি ব্যবসা করতে জানে - কোনো দানছত্র খুলে বসেনি। [6]

চীনের BRI কিভাবে কোন দেশগুলিকে সহায়তা করছে বা ব্যবসা করছে তা গুগল করলে বা YouTube ভিডিও দেখলে অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। এগুলি দেখলে একালে আধিপত্য বিস্তারের যে নতুন পদ্ধতি চীন নিয়েছে তা কতটা সার্থক এবং অন্য দেশগুলির জন্য কতটা ভালো বা মন্দ বোঝা যায়। শুরু করেছিলাম শতরঞ্জ কে খিলাড়ির প্রসঙ্গ টেনে। দুই উচ্চপদস্থ রাজনৈতিক ব্যস্ত ছিলেন খেলতে - বুঝতেই পারলেন না কখন রাজ্যহারা হয়ে গেলেন। একালে রাজনীতি, ধর্ম, দুর্নীতি আর ক্ষমতা পাওয়ার জন্য শারীরিক ও মানসিক শক্তির অপচয় - এই সবকিছুর মিশ্রণের ফল এক গৃহযুদ্ধে ব্যস্ত ভারতবাসী যেন একদিন না আবিষ্কার করে তার সমস্ত শিল্পসংস্থাগুলির সিংহভাগের মালিকানা চলে গেছে বিদেশীদের হাতে। বিদেশী বিনিয়োগ করুক - দেশটাকে যেন আবার কিনে না ফেলে - অর্থনৈতিক পরাধীনতাও স্বাধীনতার সুখ অনেকটাই কেড়ে নেবে।

যোগসূত্র

[1] "Getting lost in 'One Belt, One Road'". *Hong Kong Economic Journal*. 12 April 2016. Simply put, China is trying to buy friendship and political influence by investing massive amounts of money on infrastructure in countries along the 'One Belt, One Road'.

[2]https://scroll.in/article/963879/indias-restrictions-on-chinese-fdi-to-protect-domestic-firms-is-likely-to-backfire#:~:text=Davis%20is%20right%20that%20China,billion%20between%202015%20and%202019.&text=There%20are%20currently%2016%20FPIs,Kong%20in%20India's%20stock%20markets.

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Magampura_Mahinda_Rajapaksa_Port#:~:text=It%20is%20named%20after%20former,the%20People's%20Republic%20of%20China.

[4] https://www.china-briefing.com/news/the-china-angola-partnership-a-case-study-of-chinas-oil-relationships-with-african-nations/

[5] https://www.youtube.com/watch?v=SnmUwkYoUqo

[6] https://thediplomat.com/2020/05/pakistan-discovers-the-high-cost-of-chinese-investment/

অর্ণব দাশগুপ্ত তার স্ত্রী দীপা এবং পুত্র অর্পনের সাথে নিউইয়র্কের নিউ হার্টফোর্ডে থাকেন।

অর্ণব কবিতা, ছোট গল্প এবং সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়ে নিবন্ধ লিখতে পছন্দ করেন।

বাইশ বছর ভারতের বাইরে কাটানোর পরেও অর্ণব মনের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভারতীয় এবং এক দুর্নীতিমুক্ত সমৃদ্ধ ভারতের স্বপ্ন দেখেন।

মহালয়া

মৌবনী দাস

মোবাইলের অ্যালার্মের শব্দে ঘুম ভেঙে পাশ ফিরে শুল শ্রীময়ী। বছরের এই সময়টায় হিটার না লাগলেও অল্প ঠাণ্ডা লাগে ভোর রাতে। কম্বলটাকে অল্প টেনে গলা অবধি ঢেকে নিল ও। এই ওর এক অভ্যাস। কিছুতেই একবার অ্যালার্মের শব্দে ঘুম থেকে উঠে যেতে পারেনা। হালকা ঘুমে চোখের পাতা আবার বুজে আসার আগেই আজ সব আলস্য এক পাশে সরিয়ে মোবাইলটা হাতে নিল। চারটে বেজে পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে ঘড়িতে। ইউ টিউব টা ওপেন করে মহিষাসুরমর্দিনী টা চালিয়ে দিল লাউড স্পিকারে।

এই দিনটা থেকে ভীষণ এক মন খারাপ তাড়া করে বেড়ায় ওকে। কোলকাতার টানটা যেন আরও বেশি করে অনুভব করতে শুরু করে ও। কি বিচিত্র এই জীবন! মানুষ যখন কোন কিছু থেকে দূরে চলে যায়, যখন স্পর্শাতীত হয়ে যায় সম্পর্ক, কিংবা অভ্যাস, ঠিক তখনই অনুভূতিগুলো জানান দেয় মানুষের আসল ভালবাসাগুলোকে । হয়ত এইভাবে সুদূর প্রবাসে না এলে কখনো জানতেই পারতনা শিকড়ের টান কি ভীষণ গভীর আর প্রকট হতে পারে। হয়ত বুঝতেই পারতনা কখনো আঁকড়ে আর বেঁধে থাকাতেই জীবন বেঁচে থাকে রোজ।

কাঁচের জানলার ওপারে লালচে হতে থাকে আকাশ। শ্রীময়ী বালিশটা পিঠে দিয়ে আরাম করে উঠে বসে বিছানায়। ওপার থেকে ভেসে আসে সেই অনন্ত কন্ঠস্বর, মাতৃবন্দনার সেই ওপার আকুতি, সুগভীর অতলান্তিক অতিক্রম করে যা ওর এক কামরার এই ছোট্ট ঘরে নিয়ে আসে এক আস্ত শরত, এক ঝাঁক কাশের ছোঁয়া আর সেই ছোটবেলার ফেলে আসা পূজো পূজো গন্ধটাও।

শ্রীময়ী ভাবে, ঘরছাড়া মানুষ সারা দিনের উদযাপন গুলো শেষ হলে বেলাশেষে আবার ঘরেরই খোঁজ করে চলে শুধু, কারণ সেখানেই সে খুঁজে পায় দিনযাপনের সারল্য আর সাচ্ছন্দ্য। সাগর পেরিয়ে সেই ঘরে ফেরার অনুভূতি টুকু শুধু স্মৃতি পথ হয়ে হাত ধরাধরি করে হেঁটে চলে ঠিক অনেকদিন পর হঠাৎ দেখা হওয়া দুই প্রিয় বন্ধুর মতো। এই যেন এক্ষুনি তারা ভাগ করে নেবে কাঁচের বয়ামের শেষ আচারের ভাগটুকুও। নস্টালজিয়া ভালো লাগে ওর। ভাবনার পরশে ফেলে আসাকে ছুঁয়ে যেতে যেতে মায়ের আঁচলের হলুদের গন্ধ পায় ও। সেই গন্ধ বুকে নিয়ে ও ছুটে চলে সাগর পেরিয়ে। কাশের বন পাশে রেখে সমান্তরালে যে অকপট রেল লাইনটা ওর ছেলেবেলার স্টেশনে শেষ স্টপ দেয় সেইখানে নেমে পড়ে ও। এইতো একটু হেঁটে গেলেই ওর ফেলে আসা শিউলি তলা। আঁজলা করে তুলে নেয় সেই সুবাস। বাঁকানো উঠোনের ওই পারে ভেজানো দরজাটা ঠেলতেই লাল মেঝেটার স্পর্শ পায় ও।

"এই দিদিয়া, ওঠ না। কখন থেকে ডেকে চলেছি যে তোকে। চারটে বেজে গেছেতো ।কি ঘুম রে বাবা!" ছোট্ট ছেলেটার ধাক্কাতে উঠে বসেছে ওর দিদি। তারপর দুটিতে গুটি গুটি বেরিয়ে আসে মশারি থেকে।

রেডিও এর নবটা অন করে পা ঝুলিয়ে মহালয়া শুনতে বসেছে ভাইবোনে। এখন থেকে টানা দেড়টি ঘন্টা দুটিতে এই জায়গা ছেড়ে নড়বেইনা। রেডিওতে বেজে চলে "আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোক মঞ্জীর"। দূরে নাম না জানা পাখি নতুন ভোরের শিষ দিয়ে যায়।

আজ ওদের স্কুল ছুটি। তাই শুধুই আনন্দ সারাদিন। আকাশবাণীর পুরো টেলিকাস্টটা শেষ হতেই দূরদর্শনের মহালয়া দেখতে বসে দুজনে। এই দুর্গা অসুরের যুদ্ধ দেখতে ভারী ভালোবাসে দুটিতে। সেটা শেষ হতেই শুরু হয়ে যায় ওদের সেই মজার দুর্গা অসুর খেলাটা। ছোট্ট দিদি ফুলঝাড়ুটাকে ত্রিশূল বানিয়ে লাফিয়ে বেড়ায় উঠোনময়। আর পুঁচকে ভাই ওর কাঠের স্কেলটা কে তলোয়ার আর অঙ্ক খাতার শক্ত মলাট টাকে ঢাল করে চটপট অসুর সেজে ফেলে। শুরু হয় ওদের যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। অনেক লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ছাত-উঠোন করে যখন দুটোতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন শেষ হয় ওদের অসুর বধ পালা। ততক্ষণে ঝিকঝিকে আলোয় ঝলমল করছে নীল আকাশ। মিউনিসিপালিটির কলে বগবগ করে ফেনা তুলেছে জল। ক্রিং ক্রিং আওয়াজ করে টেলিফোন টা বেজে ওঠে বুঝি।

ধড়মড় করে ঘুম ভেঙে উঠে বসে শ্রীময়ী। আই ফোনের স্ক্রিনে শ্রমণের মুখটা জ্বলজ্বল করে ওঠে। ভিডিও কলটা কানেক্ট হতেই ছোট ভাইয়ের হাসিমাখা মুখটা সমস্ত স্ক্রিন জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে -"শুভ মহালয়া দিদিয়া".এক চিলতে হাসির সাথে শ্রীময়ীর চোখের কোণটা চিকচিক করে ওঠে। সময় পেরিয়ে মহাদেশ পেরিয়ে, স্মৃতি পেরিয়ে মুখোমুখি হয় সম্পর্ক আর নস্টালজিয়া।

সকালের অনেকটা আলো জানলার ফাঁক গলে তেরছা করে ঢুকে আসছে ঘরে। ঠিক যেন আগমনী আলো। দূরে লেকের জলে কায়াকিং করছে কেউ। ছোটবেলার গলিটা পেরিয়ে শ্রমণ-শ্রীময়ী রা হাইওয়ে ধরে এগিয়ে যায় জীবনের পথে যে যার নিজের মতো করে। তবু ওরা ফিরে ফিরে আসে, মাঝে মাঝে খুঁজতে বেরোয় ফেলে আসা বাঁক। বাঁকের পাশে লুকোচুরি খেলে চলে ধুলো মাখা পুরনো দিন। মহালয়ার ভোর গুলো সেই বাঁক ছুঁয়ে ঘরে ফেরার আবাহন দিয়ে যায় প্রতিবার। স্রোতের টানে লেকের কায়াক এগিয়ে যায় ধীরে। সময় বুড়িয়ে যায় ।

মৌবনী দাস

দীর্ঘ ৮ বছর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার পর বর্তমানে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে জীব বিজ্ঞানে গবেষণারত ডক্টরাল স্টুডেন্ট। বাংলা ভাষা অসম্ভব প্রিয়- বাংলা কবিতা, উপন্যাস, গল্প কিংবা প্রবন্ধ পড়তে, লিখতে এবং পাঠ করতে ভীষণ ভালবাসি।দক্ষিণ ভারতীয় উচ্চাঙ্গ নৃত্য ভরত নাট্যম নৃত্যধারাতে প্রশিক্ষণ নিয়েছি ২৩ বছরেরও বেশি সময় ধরে- পারফর্ম করেছি ভারত, সুইডেন এবং আমেরিকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। পড়াশুনার পাশাপাশি ঘুরে বেরাতে ভীষণ ভালোবাসি - ভালোবাসি উঁচু পাহাড়ের হাইকিং, মহাসাগরের কায়াকিং কিংবা জঙ্গলে ক্যাম্পিং এর মতো অ্যাডভেঞ্চার – ঘুরে বেরিয়েছি ভারত, ইউরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায়।

ধ্বনি

সায়ক সেনগুপ্ত

সুপ্রিয়া আওয়াজ পেয়ে দৌড়ে জানালার কাছে গেল। ধাক্কা মেরে খুলে দিল সেটাকে। দেখল আকাশ কালো করে এসেছে। একটা খুব শান্ত, স্নিগ্ধ মৃদুমন্দ বাতাস বইছে বাইরে আর তার সাথে মেঘের গর্জন। জানালাটি খোলার সাথে সাথে সেই হাওয়া ঘরে প্রবেশ করলো। সদ্যস্নাতা সুপ্রিয়ার ভেজা চুল সেই হাওয়াতে উড়লোনা, শীতল বায়ু এক মধুর অনুভূতি ছড়িয়ে ভরিয়ে দিল তার সারা অঙ্গ। পাশের দেয়ালে টাঙানো আয়েনাটির দিকে তাকিয়ে ভাল করে সে দেখল নিজের প্রতিবিম্ব। সে হল এক দীঘল তন্বী যার মোমের মতন সুকুমার মুখশ্রী। অবিন্যস্ত শাড়ী আঁচলটা সে কাঁধে টেনে নিলো।

নাহ! মাথাটা এখনো বড্ড ভিজে। জল ঝরিয়ে আজ একটু ভাল করে খোঁপা বাঁধবো। কেউ জানতে পারবেনা। সেই যে নীল চুড়ি জোড়া আমাকে অলক কিনে দিয়েছিল সেটা আর একবার পড়ি। নিজের হাতগুলোকে তাঁর বড্ড নগ্ন লাগে। বেশ মানাবে চুড়ি জোড়া তার শ্যামাঙ্গিনী দুই হাতে। কেউ জানতে পারবেনা।

বৃষ্টি নামছে আস্তে আস্তে। টিপ্ টিপ্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। তাঁর ডান হাতটা সে বার করে দিল জানালার বাইরে। বারির প্রথমকটি বিন্দু সে চরণামৃতের মতন হাত পেতে নিলো। নিজের কপালের মধ্যে তা বুলিয়ে নিলো। এরকম তো সেদিনটাও ছিল। নয় কি? এখনো মনে আছে তার সেই ঘটনা যেন ঠিক কালকেই ঘটেছিল। এমনি ভাবে সজ্জিত ছিল আকাশ, কালো বেশধারী এক নিরুপায়ে কর্মক্লান্ত বৃদ্ধার মতন। সেই দিনটিও সে এরকমই একটা আওয়াজ পেয়ে ছুটে এসেছিল অন্দরমহল থেকে; দরজায়ে কড়া নাড়ার আওয়াজ। খুলতেই দেখেছিল দুজন ইউনিফর্ম ধারি লোক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। তাদের দেখেই সুপ্রিয়ার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছিল। মুখ থেকে আওয়াজ বের করবার মতন শক্তিও তার ছিলনা। পাথরের মূর্তির মতন সে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের সম্মুখে।

একটি তীব্র যন্ত্রণায়ে ক্ষণিকের জন্য তাঁর শ্বাস রোধ হয়ে গেছিল, আঁখিজলের ধারায়ে দৃষ্টি অস্পষ্ট। অলক যুদ্ধে মারা গেছে, শহীদ হয়েছে সে। সে আর কোনদিন ফিরে আসবেনা, তাঁকে আর সে দেখতে পারবেনা, তাঁকে অবসরে কাছে টেনে নিতে পারবেনা, দুটি প্রাণের কথা কইতে পারবেনা তাঁর সাথে আর। তাদের মান অভিমানের এই সম্পর্ক শেষ হয়েছিল সেদিন। সাত-পাকে বাধা এই বন্ধন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পরেছিল সেদিন চারিধারে। দশ বছরের তিল তিল করে গড়ে তোলা এই সংসার সেই দিন হঠাৎই ফাঁকা হয়ে গেছিল। সেই টুকরো গুলোকে কি একত্র করা যায়ে?

তাদের জুড়ে হৃদয়ের বেদনা ভস্ম করে ফিনিক্স পাখির মতন আবার জীবন্ত করে তোলা যায়ে কি? তার সঙ্গী হল মাত্র দুটি বস্তু; তার অবারিত অশ্রুজল আর ক্লান্তিবিহিন একাকীত্ব। তারা কিন্তু কখনো তার সঙ্গ ছাড়েনি। আজকের এই দিনটা হাওয়ার রূপে তার সেই নিদারুণ ক্ষত লবণাক্ত করে দিয়ে গেল।

হাওয়া! কি অদ্ভুত এই হাওয়া! অদৃশ্য এক বন্ধু, আবার কখনো কখনো শত্রু বললেও অত্যুক্তি হয়েনা। এই হাওয়াই যেমন মাঝে মাঝে অলকের সুবাস উড়িয়ে নিয়ে এসে প্রস্তুত করে তার সামনে; ক্ষণেকের জন্য তার নিস্পন্দিত হৃদয়ে স্পন্দনের কারণ যোগায়ে, আবার সেই চকিতে তার যৌবনের অসমাপ্ত অধ্যায়ের কথা স্মরণ করাতেও ভোলেনা। হাওয়াই নির্জনতার তিমিরে তাঁকে ঠেলে ফেলে দেয়। একটা নির্লজ্জ বিদ্যুতের ঝিলিক আর কর্কশ মেঘের গর্জন তাঁকে আবার অতীত থেকে বর্তমানে এনে দাড় করিয়ে দিল।

তার এই তিমিরঘন জীবনে এইরূপ পৈশাচিক ঝিলিকের কি মানে? তাঁকে কি ভেংচি কাটছে পৃথিবী তার একাকিনী নারীত্বের উদ্দেশ্যে? কিন্তু তার তো কোন দোষ ছিলনা। সে তো আরও কয়টি আধুনিকা নারীর ন্যায়ে এদিক অদিক ঘুরে বেড়াতে মসগুল ছিলনা! সকাল বিকাল উপাদেয় রন্ধন করে হাসি ফুটিয়েছিল সে অলকের অধরে, ঠিক যেমন করে শুঁয়োপোকা থেকে নবরূপান্তরিত প্রজাপতি তার রঙের বাহার দেখিয়ে বাগিচা মাতিয়ে রাখে তেমন করেই সে নিজের সংসার মাতিয়ে রেখেছিল। নাহ! ত্রুটি তার হয়নি।

সেও আকাশের পানে চেয়ে বলে উঠল, 'কেবল আমিই একা নই। কাল যখন মেঘ তোমাকে ছেড়ে অন্য কোন স্থানে গিয়ে বাসা বাঁধবে কিংবা হয়তো সুদূরে মিলিয়ে যাবে, তখনো তুমি হবে একা। তখন দেখা যাবে তোমার এই দম্ভ কোথায়ে গিয়ে আশ্রয়ে নেয়। তখন যে পালাবার পথ পাবেনা। এখনি বলে দিচ্ছি, আমি কিন্তু সেই ক্ষণের অপেক্ষায়ে থাকবো। তখন আমিও তোমার দিকে তাকিয়ে ঠিক এমনি ভাবে তোমাকে তিরস্কার করব। দেখবে তখন কেমন মজা।'

অভিমান ও রাগ মিশ্রিত তর্কের উপর যবনিকা টেনে সে সজোরে জানালা বন্ধ করে দিল।

সায়ক সেনগুপ্তর জন্ম কোলকাতা শহরে ১৯৯১ সালে । সায়ক বর্তমানে বিংহাম্টন ইউনিভার্সিটিতে পি এইচডি র ছাত্র ।

বেলুন নেবে গো

সৌমি জানা

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ছেলেটা । কি সুন্দর রঙ বেরঙের টোপা টোপা বেলুন। এক একটা বেলুন আবার প্যাকেটের মতো আর একটা স্বচ্ছ বেলুনের ভেতর পোরা। দাদু বলে ওইগুলো ' ডবোল লেয়ার ' । ওইরকম ডবোল লেয়ার বেলুন নাকি এই জায়গায় আর কেউ বেচেনা ,ওর দাদু ছাড়া।

বছর সাতেকের রোগা লিকলিকে ছেলেটা হাঁ করে শোনে দাদুর কথা “ বুইলি ফেকো , অনেক হাতেপায়ে ধরে তবেই না মহাজনের কাছ থেকে এই বেলুনগুলো পেইচি। এসব হলো গিয়ে বিদেশী মাল , কত টাকা বাঁধা দিয়ে আনতে হয় বুইলি ! খবরদার হাত দিবিনে , সবকটা বেচতে হবে রে। একটা লোসকান হলেই হারামজাদা মহাজন পয়সা কাটবে।"

ফেকোর দাদু হারান বেলুনের হকার। আগে রাজমিস্তিরির জোগাড়ের কাজ করত। এখন বয়স হয়ে গিয়ে শরীর নেয়না , তাই হকারি করে। প্রতি সপ্তায় কোলকাতা থেকে ডবোল লেয়ার বেলুন নিয়ে আসে হারান। মফঃস্বল শহরে খুব কদর ওই বেলুনের। বটঝুড়ির মাঠের ধারে বসলে হু হু করে কাটতি। সন্ধ্যের মধ্যেই সব ফাঁকা। মহাজন খুশি , বুড়ো হাড়েও ছেলে-বৌ এর সংসারে দু চার পয়সা নিয়ে আসে হারান। উপরি পাওনা হিসেবে একমাত্র নাতিটাও পায়েপায়ে ঘোরে , বেলুনের লোভে।

প্রতিদিন বিকেল হলেই দাদুর সাথে বেলুন বেচতে যায় ফেকো। ওর মা বাবুর বাড়ি কাজে যায় , চার পাঁচ বাড়ি ঠিকে কাজ। সকাল বিকেল এবাড়ি থেকে ওবাড়ি ছোটে। বাপটাও জোগাড়ে , সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর একটু আমোদ আহ্লাদ করে ঘরে ফিরতে রাত হয়ে যায়। সকাল বেলা সরকারি ইস্কুলে যায় ছেলেটা , ওরা মিড়-ডে মিল এ ভাত দেয়। বেলা গড়াতেই বেলুন বেচতে যায় ফেকো , দাদুর হেল্পার হয়ে। মাঝে মাঝেই বেলুনের গোছা ধরতে দেয় দাদু , শক্ত করে হাতের মুঠিতে সুতোগুলো জড়িয়ে রাখে ফেকো। কাজটা খুব ভালো লাগে ওর।

হারান জানে নাতিটার খুব শখ একখানা ডবোল লেয়ার বেলুন নিয়ে খেলার। কিন্তু উপায় নেই, একটা না বেচলেই কড়কড়ে সাঁইত্রিশ টাকা কাটবে মহাজন ! তবে নাতির হাতে বেলুনের গোছা ধরতে দেয় মাঝেমাঝে। ওতেই বড় খুশি হয় ছেলেটা , বোঝে হারান। অবশ্য দিয়েছিল একবার একটা বেলুন নাতিকে। একটা খুঁত বেলুন , বিককিরি হয়নি। দিনের শেষে ফেকোর হাতে দিয়েছিল হারান। সেই নিয়েই ছেলেটার কি আনন্দ। পাক্কা তিনদিন হলুদ রঙের পানপাতার মতো হাসিমুখ বেলুনটাকে নিয়ে মেতেছিল ফেকো। তারপর চুপসে গেল বেলুন।

এরপর থেকে রোজই ভাবে ফেকো , অন্তত একখানা বেলুন যেন সেইদিন বিককিরি না হয় দাদুর । তাহলে হয়তো সেইটা ওর হাতে আসবে দিনের শেষে।

চলছিল বেশ। তারপর কি যে শাপ লাগল , কোন এক রোগে পৃথিবী জুড়ে যেন শুরু হলো মড়ক ! ঘর থেকে বেরোলেই ধরবে অসুখ। দোকানপাট , কল কারখানা সব তালাবন্ধ। ফেকোর ইস্কুলটাও বন্ধ করে দিল। কাজকম্মো লাটে , দেশজুড়ে শুরু হলো লকডাউন।

মাসের পর মাস কাজ বন্ধ। ঘরে বসে আর দিন গুজরান হচ্ছে না 'দিন আনা দিন খাওয়া' পরিবারটির। প্রথম দিকে পার্টি বাবু, পুলিশ বাবুরা একটু আধটু চাল-ডাল দিচ্ছিল। তারপর সেও বন্ধ হয়ে গেল।

আধপেটা খেয়ে কোনোরকমে বেঁচে আছে। লোকের বাড়ি বাসন মাজার কাজগুলোও আর নেই ফেকোর মায়ের। কেউ কাজে আসতে দেয়না , অসুখের ভয়ে। ওদের বস্তিতে মরছেও মানুষ ওই রোগে।

গত কদিন লকডাউন ওঠায় হারান ছুটেছিল মহাজনের কাছে। নিয়ে এসেছিল থান দশেক ডবোল লেয়ার বেলুন। কিন্তু দুদিন ধরে সারা শহর ঘুরেও একটা বেলুন বেচতে পারেনি। লোকজন ভয়ে কেনেনি। বলেছে কি জানি কার হাতের ছোঁয়া , কিনলে যদি সেই অসুখ হয় !

সন্ধ্যে পেরিয়ে রাত নামছে। বেলুনের গোছা হাতে ধরে মাথা নিচু করে রাস্তার পাশে ফুটপাতের ওপর বসে হারান। পাশে বসে ফেকো। দাদুকে দেখে বড্ডো কষ্ট হচ্ছে ওর আজ। বেলুন কিনতে লোকজনকে কতই না বললো দাদু , কিন্তু কেউ নিল না। গরমে ঘুরে ঘুরে হাঁপিয়ে যাচ্ছিল ওরা , তেষ্টায় গলা শুখনো । সঙ্গে আনা বোতলের জলটা সেই কখন শেষ হয়ে গেছে। এত কিছু করেও এক কানাকড়ি বিককিরি হয়নি।

আগে ফেকো ভাবতো সব বেলুন যেন না বেচে দাদু, অন্তত একটা যেন পরে থাকে ওর জন্য। আর আজ ওর মনে হলো দাদুর হয়ে যদি একটা বেলুনও বেচতে পারত ও !

হঠাৎ হারানের হাত থেকে বেলুনের গোছাটা টেনে নিয়ে সিগন্যালে দাঁড়ানো গাড়িগুলোর দিকে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ছুটে গেল ফেকো, “বেলুন নেবে গো ..... বেলুন.........ডবোল লেয়ার বেলুন......”

সৌমি জানা নিউ জার্সির বাসিন্দা। লেখালিখি ছাড়াও বাচিক শিল্প ও নাটকের চর্চা করেন। বাংলা তথা ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন নিয়মিত।ছোটদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে বিশেষ ভালোবাসেন। কর্মসূত্রে শিক্ষাজগতের সঙ্গে যুক্ত।

জল

দেবাশিস দাস

দিন শেষ হইয়া আসিতেছে। সূর্য অস্তাচলে। সম্পূর্ণ অন্ধকার তখনও হয় নাই। সিঁদুরে আলোয় পৃথিবীটা যেন কেউ ঢাকিয়া দিয়াছে। পক্ষীগন কুলায় ফিরিতেছে। তাহাদের কলকাকলিতে চারিদিক মুখরিত। রাজপ্রাসাদের দ্বিতলে গিয়া একটি সুদৃশ্য আরাম কেদারায় গা এলাইয়া দিলেন রাজকুমার সৌম্য নারায়ণ চৌধুরী। সামনের সবুজ মাঠ ও দিঘির কাকচক্ষু জল নিরীক্ষণ করিতে করিতে চক্ষুদ্বয় কিঞ্চিৎ লাগিয়া আসিল। বাতাস বহিতেছে। মনে হইল কপালে কেহ স্নিগ্ধ হাত বুলাইয়া দিতেছে। ভীষণ আরাম বোধ করিতেছেন তিনি। এমত সময়ে একটি অস্পষ্ট কিঙ্কিণীর আওয়াজ নুপুরনিক্কনের সাথে মিলিয়া যেন তাহাকে কোন মায়াজালে আবদ্ধ করিল। হঠাৎ একটি গুমোট ভাব অনুভব করিলেন রাজকুমার। মুদিত চক্ষু অনেক চেষ্টায় কিছুটা খুলিয়া দেখিলেন এইটুকু সময়ের মধ্যেই আকাশ জুড়িয়া ঘন কৃষ্ণবর্ণ মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন কেহ কোথাও নাই। ক্ষণেক পূর্বে যে নূপুরনিক্কণ তিনি শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহা মনের ভুল।

সামনের দীঘির জলে মুষলধারে বারিপাত হইতে লাগিল। এ তাহার বড়ই প্রিয় দৃশ্য। যাহারে কয় নয়নাভিরাম। মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। হাত বাড়াইয়া সামনের টেবিল হইতে নিজের অত্যন্ত প্রিয় বেহালাটা তুলিয়া লইয়া মেঘমল্লারে আলাপ শুরু করিলেন। শ্রোতারা বলেন তার বাজনার হাত বেশ মিষ্ট। কিয়দ্দিন পূর্বেই পাশের রাজ্যের সুন্দরী রাজকন্যা কঙ্কমালার সহিত তাহার বিবাহ স্থির হইয়াছে। পিতা নিজেই তার বন্ধুকন্যাকে এই প্রাসাদে আনিতে প্রস্তুত। আগামীকালই সেই দিন। রাজপ্রাসাদে সাজ সাজ রব। এই বৃষ্টির আবহ সেই কন্যার আগমন প্রস্তুতিকেই সম্পূর্ণ করিয়া তুলিল। দাসী একটি সেজবাতি জ্বালাইয়া দিয়া গেল। তাহার নির্দেশে এই কক্ষে উজ্জ্বল আলো নিষিদ্ধ। বিশেষ করিয়া যখন তিনি সঙ্গীত চর্চায় রত।

একান্তে থাকিলে সুমিতের মাতার কথা মনে পড়ে। বেশীদিন তো হয় নাই তিনি চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শরীরের সুঘ্রাণ চক্ষুমুদিলেই প্রাসাদের আনাচ কানাচ হইতে কুমার সৌম্য পাইয়া থাকেন। মনে হয় মাতা সারাক্ষণ সাথে সাথেই আছেন। যেন এখুনি তাঁহার সস্নেহ করস্পর্শ তাঁহার কপোলে তিনি অনুভব করিবেন। পাশের রাজ্যের রাজকন্যাটিকে মায়ের খুব একটা পছন্দ ছিল না। বাবার পছন্দের কারণে কখনও জোর কণ্ঠে 'না' কহেন নাই। শুধু সৌম্যকে বলিতেন যে কন্যার বেশ অহংকার আছে এবং সে বেশ ব্যাক্তিত্বময়ী। সৌম্যকে বিবাহের পর সে-ই চালনা করিবে। কাজেই সে যেন এই সমস্ত বুঝিয়া সুঝিয়া বিবাহে সম্মতি দেয়। কিন্তু মাতার দেহাবসানের পর পিতাই উদ্যোগী হইয়া শীঘ্র বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সৌম্যর কখনও কখনও মনে হইয়াছে মা হয়ত ঠিক কথাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু সকলে তাহাকে বুঝাইয়াছিল যে কন্যা যখন অত্যন্ত রূপবতী ও গুণবতী তখন তাঁহার কিছু অহংকার থাকিতেই পারে। হাজার হউক সেও তো এক রাজ্যের রাজকন্যা। অহংকারে দোষের কিছু নাই। আর সংসার করিতে করিতেই সব ঠিক হইয়া যাইবে।

কুমার একথা মনে মনে স্বীকার করেন যে এই কন্যাটি তাহাদের রাজ্য সঠিকভাবে চালাইতে পারিবে। তাঁহার নিজের অবশ্য রাজনীতি, প্রজাপালন ইত্যাদিতে বিশেষ মন নাই। সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী এহেন একজন স্ত্রী হিসাবে

সাথে থাকিলে অন্য সব ভুলিয়া নিজের সঙ্গীত ও সাহিত্যচর্চা পুরোদমে চলিবে। মনের শান্তিও বজায় থাকিবে। দুই রাজার পক্ষ হইতে শুধু তাহাদের দুজনের জন্য একবার বনভোজন ও মৃগয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই অজুহাতে তাহারা দুইজন বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে প্রাসাদের বাহিরে গিয়া নিজেদের মধ্যে পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। মাস কয়েক আগের সেই দিনটিকে কুমার সৌম্য নারায়ণ কখনও ভুলিবে না। হরিণ শিকারের ছলে তাহারা দুইজন অরণ্যের গভীরে চলিয়া গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় ঝড় জলের মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলাতে সৌম্য ভয় পাইয়াছিলেন। কিন্তু অতি বিচক্ষণ কন্যাটি তাহাকে যেভাবে অভয় প্রদান করিয়া সাহস যোগাইয়াছিলেন তাহা ভুলিবার নহে। শুধু তাহাই নহে, সেদিন সন্ধ্যার আধো অন্ধকারে, একটি আক্রমণে উদ্যত ভল্লুক হইতে কৌশলে বৃক্ষে উঠিয়া রাজকন্যার বুদ্ধিতে তাহারা নিজেদের বাঁচাইয়াছিলেন তাহা কেবলই মনে পড়ে। ভল্লুকটিকে হয়ত সেদিন অস্ত্রাঘাতে আহত করা যাইত। কিন্তু রাজকন্যা জীবটিকে আঘাত করিতে রাজি ছিলেন না। তাহার বিচক্ষণতায় দুজনেই ভল্লুকের চোখে ধূলা দিতে পারিয়াছিলেন। তাহাতে নিজেরাও অক্ষত ছিলেন আর জীবটিরও প্রাণ বাঁচিয়াছিল। সেদিন মেঘলা আকাশের ছায়া রাজকন্যার কাজল চোখে পড়িয়াছিল। সেই চোখে অসীম সাহস ও মায়া দুয়েরই মিশ্রণই দেখিয়াছিলেন কুমার সৌম্য।

এই বিবাহে পিতার উৎসাহের অন্য কারণও আছিল বৈকি। একে তো প্রিয় বন্ধুর কন্যা, তায় সুন্দরী ও গুণবতী, তাছাড়া তাঁহার রাজ্য ঘিরিয়া যে দুইটি শত্রু রাজ্য আছে তাহাদের মোকাবিলা করিতে তাহাদের দুই মিত্র রাজার আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া খুবই জরুরী। তা না হইলে রাজ্যপাট রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিবে। সবচেয়ে বড় কারণ হইল, তাঁহার নিজের পুত্রটি বড় সরল। নিজের কাব্য ও সঙ্গীত লইয়াই তাঁহার দিন যায়। এমতাবস্থায় একটি ব্যাক্তিত্বময়ী স্ত্রী তাঁহার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। নচেৎ পিতার অবর্তমানে রাজ্যপাট রক্ষা করা তার একার পক্ষে সম্ভব হইবে না। এছাড়াও কন্যাটি একমাত্র সন্তান হওয়াতে এই বিবাহের ফলে দুইটি রাজ্য এক হইয়া ভবিষ্যতে একটি বড় রাজ্য তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই প্রবল।

এইসকল ভাবনার মাঝে মায়ের মতামত মনে আসিতেই সৌম্য চিন্তাম্বিত হইয়া পড়িলেন। তিনি নিশ্চিত নন যে এই বিবাহ তাকে একটি সুন্দর জীবন উপহার দিবে কিনা। অবশ্য তিনি সব বিষয়েই দ্বিধান্বিত থাকেন। বিবাহের বিষয়টি ব্যতিক্রম হইবে কি করিয়া? এদিকে বৃষ্টির বিরাম নাই। বাহিরের ঘন অন্ধকারে হাওয়ার বেগ ক্রমশই প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। এই শ্রাবণে রাজ্যের পাশের নদীটি খুবই স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল। আজ বুঝি কুল ছাপাইয়া প্লাবিত হইয়া পড়ে। অনুচর খবর দিল, একদল গ্রামের লোক আসিয়া রাজামশাইয়ের কাছে দরবার করিয়া কহিতেছে যে নদীবাধ হইতে যাতে জল ছাড়িয়া দেওয়া হয়। না হইলে জলাধার ছাপাইয়া ওপারের গ্রামগুলি জলের তলায় চলিয়া যাইবে। কিন্তু অন্যদিকে আবার জল ছাড়িলে রাজ্য প্লাবিত হইবে। এমনকি রাজপ্রাসাদেও জল ঢুকিতে পারে। কালই বিবাহ। সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত। এমতাবস্থায় জল ছাড়া প্রায় অসম্ভব। এসব কথায় প্রজারা আরও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা শুনিতে চাহিতেছে না। তাহাদের এখন মরণ বাঁচন সমস্যা।

কুমার কিছুটা চিন্তায় পড়িলেন বটে তবে কোন চিন্তার তিনি কখনও কুল কিনারা করিতে পারে না। পরে ভুলিয়া যান। কিয়ৎক্ষনের মধ্যেই বর্ষার জলধারায়, নদীর স্রোত ও মেঘ গর্জনের শব্দে, সবকিছু ভুলিয়া নিজের বেহালাখানি আবার হাতে তুলিয়া লইলেন। এবারে বেহালায় যেন ঝড় উঠিল। রাগের আলাপ, জোড় ডিঙাইয়া অতি দ্রুত মেঘমল্লারের ঝালায় পৌঁছাইয়া গেলেন। অন্ধকার মেঘলা আকাশে শুধু ভাসিয়া রহিল একজনের দুটি কাজল-কালো আঁখি, মায়ের সাবধান বাণী অগ্রাহ্য করিয়া কালই যাহাকে ঘরে আনিতে

চলিয়াছেন তিনি। বেহালার সুরের লুক্কায়িত কান্নার আওয়াজ ছাপাইয়া বিরাট এক আয়োজনের সুর তাহাকে অবশ করিয়া রাখিল। কতক্ষণ এইভাবে চলিয়াছিল তাঁহার খেয়াল নাই। হঠাৎ রাজবাড়ির ফটকের কাছে প্রবল কোলাহল শুনিয়া তাঁহার মন বিচলিত হইল। বুঝিলেন সুর কাটিয়া গিয়াছে। তাঁহার বিরক্তি আরও বাড়াইয়া অনুচর আবার কক্ষে প্রবেশ করিল। সে সংবাদ দিল- 'মহারাজ অসুস্থ বোধ করিতেছেন। আপনি দরবারে চলুন। বাহির ফটকের কাছে বিক্ষুব্ধ প্রজারা জড়ো হইয়াছে। ভিতরের প্রহরীদের তাহারা বাহিরে আসিতে দিতেছে না। ওদিকে অন্যান্য প্রজারা তাহাদের গ্রাম বাঁচাইতে নদীর বাধ কাটিয়া দিতেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জল প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করবার আশঙ্কা করিতেছে সবাই। গ্রামের মানুষের সাথে শত্রু রাজ্যের সৈন্যরাও নাকি হাত মিলাইয়াছে। তাহা না হইলে এত সাহস প্রজারা পায় কি করিয়া'? কোন উপায় কি নাই? রাজকুমার ভীত চক্ষু মেলিয়া দূরে চাহিলেন। কিয়ৎক্ষন পরে অন্ধকার পথে কোথাও যেন মশালের আলো দেখা গেল। এত দূর হইতেও সুতীব্র হ্রেশ্বা ধ্বনি তাঁহার কর্ণ গোচর হইল। কারা আসিতেছে।শত্রুপক্ষ কি? সহসা দেখিলেন অনুচরের দৃষ্টি খুশীতে ভরিয়া উঠিয়াছে। উৎফুল্ল কন্ঠে সে কহিয়া উঠিল। 'আর চিন্তা নেই কুমার, বউদিমনি তাঁহার সৈন্য লইয়া আসিয়া পরিয়াছেন। তিনি সুকৌশলে প্রজাদের সরাইয়া রাজ্য বাঁচাইবেন। আবার প্রজাদেরও বাঁচাইবেন। যাই মহারাজকে খবরটা দিয়া আসি'। ঠিক তখনই অগ্রসরমান প্রবল জলের শব্দ অনুচরের কন্ঠস্বরকে ডুবাইয়া দিল। এ যেন প্রতিযোগিতা, কে আগে পৌঁছাইবে? বন্যার জল? না কি রাজকন্যা কঙ্কমালা? নীচের শোরগোল ভীষণ হইয়া উঠিল। প্রবল কোলাহল নিকটে আসিয়া পড়িতেছে--।

****

প্রবল চিৎকার সহযোগে একটি রামচিমটি খেয়ে আরামের ঘুম ভেঙে একেবারে বিছানায় উঠে বসল শ্যামাচরণ। স্ত্রী কিঙ্করী কাক চিল বসতে না দেওয়া কাংস-বিনন্দিত কন্ঠে চিৎকার করছে। 'হাড় মাস কালি করে দিল গো! বাপ মা কেন যে এমন ন্যালাখ্যাপা লোকের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিল? আমি কি পাপ করেছিলাম? -এই শোনো, বাড়ীওয়ালা জল বন্ধ করে দিয়েছে। কিভাবে রান্না, কাপড় কাচা, ঘরদোর পরিষ্কার হবে বলতে পার? আরে বলছি কাকে? এই লোকের কি কোন চিন্তা আছে বাড়ির লোকের জন্য? বাচ্চাদের জন্য? জন্ম দিয়েই তো খালাস। ঘেন্না ধরে গেল গো? ওঠো বলছি নাহলে কিন্তু অনর্থ করব'!

অনর্থের আর বাকি নেই কিছুই। বৃষ্টিতে পাড়ার রাস্তায় কোমর ডোবানো জল। অথচ বাড়িতে কলে একফোঁটাও জল নেই। শ্যামাচরণের মনে পড়ল, বাড়ির চার মাসের ভাড়া বাকী। ভাড়া না দিলে বাড়ীওয়ালা আর থাকতে দেবে না।

দেবাশিস দাস বর্তমানে গুজরাটের মেহসানাতে থাকেন।
একটি 'তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধান' সংস্থায় কর্মরত।
বাংলার বাইরে বঙ্গসংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত।
নেশা সাহিত্যচর্চা, বিশেষত: একনিষ্ঠ পাঠক হিসেবে।
বিভিন্ন সময় বিক্ষিপ্তভাবে লেখালেখি করেছেন।
বিগত কয়েকবছর ধরে নানান পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লেখার চেষ্টা করছেন।

রুপুর পাখি

পায়েল চ্যাটার্জি

১

রুপু মেঘের মাঝে ভেসে বেড়ায়। মেঘের হাত ধরে আকাশ জুড়ে পাখিদের খুঁজে বেড়ায়। ওই তো সেই নাম না জানা পাখিটা। লাল ঠোঁট, রামধনুর মতো ডানা। নারকেল গাছে বসেছে। রুপু ধরতে গেল। ফস করে উড়ে পালালো পাখিটা। অ্যালার্মের আওয়াজে ঘুমটা ভেঙে গেল যথারীতি। আবার সেই একই স্বপ্ন। রূপাঞ্জনা মিত্র, বিখ্যাত অরনিথোলজিস্ট রোজ একই স্বপ্ন দেখে। গত পাঁচ বছর ধরে। পাখিদের নিয়ে কাজ করতে করতে রুপু কি তবে হ্যালুসিনেট করছে! শিকাগোর বিল জার্ভিস পক্ষী অভয়ারণ্যে কর্মরতা রুপুর গত পাঁচ বছর ধরে সবচেয়ে বিশ্বস্ত সঙ্গী ভোর বেলার এই স্বপ্ন।

তবে এই অদ্ভুত স্বপ্নের কারণটা খোঁজার অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে রুপু। অমল কান্তি যেমন রোদ্দুর হতে চেয়েছিল, রূপাঞ্জনাও সবসময় পাখিদের বন্ধু হতে চেয়েছে। তার যে এমন একটা পোশাকি গুরুগম্ভীর নাম আছে সেটা তখন রুপু জানতো না। বাবা প্রথম থেকেই চাইতো রুপু জার্নালিজম পড়ুক।বিখ্যাত একটি সংবাদপত্রের সিনিয়র অ্যাডভাইজারি অফিসার বাবা মনে করতেন, সাংবাদিকতা মানেই দেশ সেবা। মানুষের কাছে সমাজের বার্তা সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়া। দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র গঠনে যোগদান করা। বাবা সামাজিক দূষণ হীন রাষ্ট্র গঠনের কারিগর করতে চেয়েছিল রুপুকে।

রুপুও তার দেশকে ভালোবাসে, দেশের প্রতি নিজের কর্তব্য, দায়বদ্ধতা অনুভব করে। কিছু দুঃস্থ ছেলেমেয়েকে বিনামূল্যে পড়াত রুপু। পুঁথিগত শিক্ষার বাইরেও তাদের কম্পিউটার ব্যবহার করা শিখিয়েছিল। ওই কচিকাঁচা গুলোকে রোজ উৎসাহ দিত জীবনের পথে এগিয়ে চলার জন্য। আচ্ছা এতে কি বাবার স্বপ্ন পূরণ হতো না? একদিকে বাবার ইচ্ছের মান রাখা, অন্যদিকে নিজের স্বপ্ন পূরণের চাবিকাঠির খোঁজ দুইয়ে মিলে রূপাঞ্জনা মিত্র নিজেকে পরিপূর্ণ মনে করত।

তার সেই পূর্ণতার ভাবনায় ছেদ পড়ল , যেদিন রুপু কলকাতার একটা কলেজের অরনিথোলজি বিভাগে ভর্তির পরীক্ষায় পাশ করল। বাড়ির পরিবেশটা বদলে যেতে শুরু করল। বাবার সঙ্গে সম্পর্কটায় অদ্ভুত শীতলতা জমতে শুরু করেছিল। মা বরাবরই নির্লিপ্ত থাকতো এসব ব্যাপারে। স্বামী-সন্তানের খাওয়া-দাওয়া আর তাদের কিছু গতানুগতিক চাহিদার কথা মাথায় রাখা, এটাই মায়ের জগত ছিল। পারিপার্শ্বিক সবকিছুতে মা বিরাজ করলেও তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করত পারত না রুপু। সংসারের কিছু গতানুগতিক বিষয়ের বাইরে কোনকিছু নিয়ে নিজের মতামত দেওয়ায় স্বচ্ছন্দ ছিল না মা। রুপুর জগত ছিল বাবাকে ঘিরে। স্কুলের টিফিন গোছানো থেকে শুরু করে টিচারের বকুনির ধরণ নকল করে দেখানোর অপার্থিব আনন্দ, সবকিছুর

সঙ্গী ছিল বাবা। ফ্রেন্ড,ফিলোজফার, গাইড। মা'র স্থান ছিল না সেখানে। মা কখনো জোর করে কোন জায়গা নেওয়ার চেষ্টাও করেনি। রুপুও কি দেওয়ার চেষ্টা করেছিল..? বাবার সাংবাদিকতা পড়ানোর জেদ আর রুপুর পক্ষী বিশারদ হওয়ার স্বপ্ন যখন যুদ্ধ করছে মা একবার কথা বলেছিল রুপু আর বাবার মাঝে। "মেয়ে তোমার আদর্শেই দীক্ষিত, আবার তোমার মতই জেদি। ওকে ওর স্বপ্ন পূরণ করতে দাও"। মা কি তবে সব বুঝত? কিন্তু যার বুঝতে পারার প্রত্যাশা ছিল রুপুর মনে সেই বাবা কেন বুঝলো না?

কলেজে পড়াশোনা চলাকালীন তিনটে বছরের জীবন রুপুর কাছে যুদ্ধের মতো ছিল। দুর্বিষহ সময়। খাবার-দাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মায়ের দাক্ষিণ্যে হাতের কাছে পেয়ে যেত রুপু। বাবার সঙ্গে দেখা হলেও সে দেখায় অদেখাই ছিল বেশি। কয়েকজন মানুষ প্রতিদিন নিয়মমাফিক পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে, তাদের অব্যক্ত কথাগুলো বাড়িময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবু তারা একে অপরের কথা শুনতে পাচ্ছে না বা শোনার চেষ্টা করছে না। বরফের মতো জমাট বাঁধা সম্পর্কের মাঝে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছিল রুপু। তাই স্নাতকোত্তর পড়াশোনা, পিএইচডি, চাকরি সবই করেছে বাড়ি থেকে অনেক দূরে। চেষ্টা শুরু করেছিল কলেজে পড়াকালীনই। শিকাগোর একটি ইউনিভার্সিটিতে সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলো বিশেষ এক প্রথাগত অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে।

দেশ,পরিবার,অনুভূতি, জমাট বাঁধা কষ্ট সবকিছুকে বিদায় জানিয়ে চলে এসেছিল এই দেশে। বাবা সারাদিন দরজা বন্ধ করে বসেছিল সেদিন। মায়ের চোখে মুখে যেন কেউ কালি লেপে দিয়েছিল। রুপুর কষ্টগুলো যেন পাথরের মত শক্ত হয়ে গিয়েছিল। তারপর নতুন দেশ, কাজ আর ওই অদ্ভুত স্বপ্নটা। বিল জার্ভিস পক্ষী অভয়ারণ্যের পাখিরাই তার বন্ধু। রোজ দেখা এই স্বপ্নটা নিয়ে মনোবিদের কাছে যাওয়ার কথা ভেবেছিল কয়েকবার। তারপরই মনে হয়েছে এই রহস্যময় স্বপ্ন কি রুপুর কোন ক্ষতি করছে? এর কোনও সদুত্তর নিজেকে দিতে পারেনি সে। তাই আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। বন্ধু বিহীন এই দেশে এই বিষয়টা নিয়ে কারোর সঙ্গে পরামর্শ করাও হয়ে ওঠেনি। আর কাকে বলবে? বাবা-মা। হ্যাঁ যোগাযোগ তাদের সঙ্গে রয়েছে। সপ্তাহান্তে ফোন দু'একবার। প্রাণহীন সম্পর্কগুলোর বরফ আজও গলেনি। শুধু গতানুগতিক যোগাযোগ বজায় রেখে গেছে। আর পূজা-পার্বণে কখনো নিয়মমাফিক বাড়িতে কিছু পাঠিয়ে দিয়েছে।

২

দীর্ঘদিনের ওয়ার্ক ফ্রম হোমএর পর্ব মিটিয়ে আজ অফিস জয়েন করেছে রুপু।বিকেলে মনোবিদ এর কাছে অ্যাপোয়েন্টমেন্টও করিয়েছে। তার আগে বাড়ী ফিরতে হবে একবার। কিছু কাগজপত্র নেওয়ার জন্য। লাইট অন করলেও সব অন্ধকার কেন বাড়িতে? সাধারণত এমনটা হয় না। এটাও কি কোন নতুন হ্যালুসিনেশন নাকি কোন বৈদ্যুতিক সমস্যা?

ইলেকট্রিশিয়ানের নম্বরটা ডায়াল করতে যাবে, রুপুর কাঁধে একটা হাত। কি ঠাণ্ডা হাতটা। ঠিক বাবার মত। বাবার হাত এরকমই ঠাণ্ডা থাকতো। স্নিগ্ধতার ছোঁয়া। ঘুরে তাকাতেই অবাক হওয়ার পালা। এ কাকে দেখছে রুপু? বাবা! ওদিক থেকে মোমবাতি নিয়ে গিয়ে কে এগিয়ে আসছে? পরনে সেই নীল শাড়ীটা যেটা রুপু একবার পুজোতে মা'কে পাঠিয়েছিল ! মা ! রুপু কি স্বপ্ন দেখছে ? নিজেকে চিমটি কেটে দেখবে একবার ? এমন সময় চারিদিকে আলো জ্বলে উঠলো। " তোর রুমওনার বলে গিয়েছিল, কিছু গোলমাল ছিল মিটার বক্সে, সারাতে লোক এসেছে"। বাবার গলাটা কেমন যেন ভাঙ্গা-ভাঙ্গা শোনাচ্ছে। সেই ইস্পাত কঠিন

কন্ঠস্বর কোথায় ! "তোর প্রিয় গাজরের কেক তৈরি করে এনেছি, খাবি তো? আজ যে তোর জন্মদিন"! মায়ের গলার স্বরে আকুলতা। এই প্রথম বুঝতে পারছে রুপু। রুপু কথা বলছে না। দেখতে পাচ্ছে তবে। অভিমানের পাহাড় চুর-চুর করে ভেঙে পড়ছে। বরফ গলে সেই জলে নদী তৈরি হয়েছে। বোবা কষ্টরা বয়ে চলেছে তাতে। বাবা-মা আবার কথা বলছে। "আর পারছিলাম না আমরা, তুই আর অভিমান করে থাকিস না"।

আজ রুপুর জন্মদিন! মনেই ছিলনা ওর। রুপু এখনো কথা বলছে না। তবে মায়ের কোলে মাথা দিয়ে, বাবার হাত জড়িয়ে শুয়ে আছে। খুব ঘুম পাচ্ছে। স্বপ্ন দেখছে রুপু। মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। ওই তো সেই লাল রঙা ঠোঁটের পাখিটা। রুপুর একদম পাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। রুপু ওকে ছুঁতে পারছে। রুপুর কাছে এসে কানে কানে বলছে " আমি আর আসব না, তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোবে এবার, যে যন্ত্রণা মাথা অনুভূতি তাড়া করে বেড়াত তোমায়, আজ তুমি মুক্ত সেই সব গ্লানি থেকে, অধরা সম্পর্কগুলো আবার তোমার সঙ্গ পেয়েছে"। রুপু হাসছে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে । অমলিন, নিষ্পাপ হাসি, ছোটবেলার মতো।

পায়েল চ্যাটার্জি

কর্মক্ষেত্র- আকাশবাণী কোলকাতা

শখ- লেখালিখি, গীটার বাজানো, ছবি আঁকা

ফেরা

সুদীপ সরকার

রসময় বাবু ইদানীং একটা সমস্যায় পড়েছেন।

নির্বিবাদী শান্ত স্বভাবের রসময় বাবুর এমনিতে কোন ঝামেলা নেই, শরীর স্বাস্থ্য গড়পড়তা অন্যান্য মানুষের তুলনায় বেশিই ভালো, পারিবারিক দিক থেকেও নিশ্চিন্ত, সামাজিক বা অর্থনৈতিক, কোন দিক থেকেই কোন উৎকণ্ঠার কারণ নেই, তবুও দিন কয়েক হোল তাঁর আর আগের মত চটপট ঘুম আসছে না। যেখানে সেখানে, যখন তখন ঘুম আর ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখা, এ রসময় বাবুর আজন্মকালের মজ্জাগত ব্যাপার। কিন্তু সেই ঘুম যদি হঠাৎ করে অনিশ্চিত হয়ে পরে, চিন্তার কারণ থাকে বৈকি!

পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক রসময় বাবু গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে শিক্ষকতা করছেন। আগামী মাসে অবসর গ্রহণ করবেন চাকরি থেকে। দিন কয়েক আগে ছাত্র সংসদের অনুষ্ঠানে তাঁকে বরেণ্য প্রবীণ শিক্ষক হিসেবে একটা সংবর্ধনাও দেওয়া হোল কলেজের তরফে। সেদিনই প্রথম রসময় বাবুর মাথায় এলো কথাটা, অবসরের পরে কি ভাবে সময় কাটবে! সেই থেকেই এই উপসর্গ, চোখ বুজলেই খালি মাথায় ঘুরপাক মারছে একটাই কথা, কি করে সময় কাটবে! এদিকে ঘুম না হলে রসময় বাবুর মেজাজ খিচড়ে ওঠে, মাথা ঝিম ঝিম করে, পরিশ্রান্ত লাগে আবার কোষ্ঠ কাঠিন্যও হচ্ছে আজকাল। অথচ এই যখন তখন ঘুমিয়ে দেখা ছবির মত স্বপ্ন গুলো জীবনের কত কঠিন সমস্যা থেকে তাঁকে উদ্ধার করেছে তা ওনার থেকে ভালো আর কে জানে।

এই যেমন, প্রায় তেত্রিশ বছর আগে যখন বিয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্রীর খোঁজ চলছে, তখন একই সাথে শ্রীরামপুরের তাঁরাসুন্দরি আর কৃষ্ণনগরের মৃন্ময়ী দেবী কে পছন্দ করলেন রসময়ের মাতৃদেবী। দুজনেই সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুলক্ষণা, শিক্ষিতা যোগ্য পাত্রী হিসেবে বিবেচিত হলেন, কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব তিনি ছাড়লেন রসময়ের ওপর। রসময় পড়লেন ফাঁপরে, আন্সারটেন্টি প্রিন্সিপাল বা কোয়ান্টাম মেকানিক্স গুলে খাওয়া ভালো ছাত্র হলে কি হবে, দুজন সমগুনি রমণীর মধ্যে থেকে একজন কে সহধর্মিণী হিসেবে বেছে নেওয়ার ব্যাপারে কোন অকাট্য যুক্তিই তিনি দাড়া করাতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত ভোর রাতে দেখা স্বপ্নের মধ্যে হঠাৎ করেই ভেসে উঠল তাঁরাসুন্দরির মুখ। মাতৃদেবী কে তাই জানালেন রসময়, স্বপ্নে দেখা সেই তাঁরাসুন্দরির সাথেই পুত্রের বিবাহ সম্পন্ন করালেন তিনি।

এই সেদিনও সেলুনে বসে চুল কাটতে কাটতে স্থির ভাবে বসেই বেশ খানিকটা ঘুমিয়ে নিলেন রসময়, আর তখনই ঘোরের মধ্যে মনে পরে গেল ব্যাঙ্কের লকারের চাবিটা সার্টিফিকেটের কালো ব্যাগের মধ্যে রেখেছেন উনি নিজেই। গত কদিন ধরে তিন তিনটে আলমারি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও লকারের চাবি উদ্ধার করতে পারেননি তারা সুন্দরী। শেষে ডুপ্লিকেট চাবি কি ভাবে পাওয়া যাবে তা জানতে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সাথে কথা বলবে বলে মনস্থির করেও ফেলেছিলেন রসময়। সেলুন থেকে বাড়ি ফিরে সার্টিফিকেটের কালো ব্যাগটি খুঁজতেই বেরিয়ে এলো হারানিধি। তারা সুন্দরী বকাবকি করলেও মনে মনে খুশি হয়েছিলেন কর্তার কীর্তিতে। রসময়ও হাফ ছেড়ে বাঁচলেন ঝামেলা এড়ানো গেল ভেবে। এহেন রসময় বাবু ঘুম হচ্ছে না বলে মুষড়ে পড়বেন তাতে আর আশ্চর্য কি।

এদিকে কর্তার এই আনচান অবস্থা দেখে যারপরনাই বিরক্ত তারা সুন্দরী, তিনি অনেকবার বুঝিয়েছেন, “অবসর তো সকলেই নেবে, তা বলে কারুর ঘুম ছুটে গেছে এরকম কখনো শুনিনি বাপু। কি করব কি করব করে এত ভাবার কি আছে? কাজের কি কোন অভাব আছে নাকি? লেখালেখি করতে পার, ফুলের

গাছ লাগাতে পার, আর কিছু না হলে, সঞ্জুর কাছে ঘুরে আসি। খুব শিগগিরি হয়ত ওরা টেক্সাস থেকে চলে যাবে, তখন আর যাওয়া হবে না” ।

রসময় আর তাঁরাসুন্দরির ছেলে সঞ্জয় প্রায় বছর কয়েক টেক্সাসে রয়েছে। নামি মেডিকেল কলেজের ডাক্তারি ছেড়ে কোলকাতায় ফেরার যাবতীয় সম্ভাবনায় জল ঢেলে সে সদ্য গ্রিন কার্ড সংগ্রহ করেছে বলে শুনেছেন রসময়, আর তারও আগে একটি মার্কিন সুন্দরির পাণিগ্রহণ করেছে বাপের চূড়ান্ত অমত সত্ত্বেও। তারা সুন্দরী চিরকালই প্রগতিশীল ধ্যান ধারণায় বিশ্বাসী, ছেলে তার নিজের বিচার বুদ্ধিতে যা করেছে তাতে তাঁর সমর্থন আছে পূর্ণ মাত্রায়, কিন্তু রসময় মেনে নিতে পারেন নি ছেলের সিদ্ধান্ত, এই নিয়ে খুব কিছু অশান্তি হয়েছে তাও না, তবে আর যাই হোক, তারা সুন্দরী ছেলের কাছে যাওয়ার নাম করলেই তিনি বেকে বসেছেন, “ও তো আমাদের কথা ভাবেনি, দেশে এখনো ডাক্তারের কত অভাব, তবুও শুধু নিজের উত্তরণের কথা ভেবে দেশ ছেড়ে বিদেশে রয়ে গেলেন মহাপুরুষ, টেক্সাস হোক আর যে খানেই হোক, তুমি গেলে যাও, আমার যাবার কোন তাগিদ নেই”।

“এভাবে ভাবছ কেন? তোমার কত ভালো ভালো ছাত্র ছাত্রী ও তো বিভিন্ন দেশে পারি জমিয়েছে, তাঁদের যদি কোন দোষ না হয়ে থাকে, তাহলে সঞ্জুর বেলায় তোমার এত কড়া মনোভাব কেন?” সাফাই দেন তারা সুন্দরী। মাথা নাড়েন রসময়, “মেধা যদি দেশের মানুষের কাজেই না লাগল তো সেই মেধার দাম কি? বিদেশে ভালো কাজের সুযোগ থাকলে সেটা অস্বীকার করতে হবে বলছি না, তবে ব্রেন ড্রেন চলতে থাকলে দেশ একদিন নিঃস্ব হয়ে পরবে তাতে সন্দেহ নেই। তোমার ভাবনা একান্তই তোমার, আমার বিচার বোধ যা বলে, তাই বললাম” ।

এদিকে ঘুম ঘুম করে ভিতরে ভিতরে কিছুটা অস্থির হয়ে উঠেছেন রসময় বাবু। পুরনো বন্ধু কাম পারিবারিক ডাক্তার অমলেন্দু সমাদ্দার বললেন, “দেখ রসময়, ঘুম না হবার পিছনে যে কারণ টা মূলত কাজ করে তা হোল স্ট্রেস, অথবা অন্য কোন রোগ। তোমার প্রেশার, সুগার, লিপিড প্রোফাইল সব তো একদম পারফেক্ট লেভেলে আছে হুইচ মিন্স দ্যাট ইওর হেলথ ইস এবসলিউটলি ফাইন। ইউ মাস্ট বি হ্যাবিং সাম স্ট্রেস। একটা করে ট্র্যাঙ্কুইলাইসার ইন মাইল্ড ডোস নিতে পার”।

তারা সুন্দরী কথা টা লুফে নিয়ে বললেন, “আসলে তো তাই, রিটায়ার এর পর কি করব তাই ভেবে ভেবে ওনার ঘুম ছুটেছে, একটু বুঝিয়ে বলুন তো আপনি” ।

হা হা করে হেসে ওঠেন ডাক্তার সমাদ্দার, “ওরে বাবা, রিটায়ার করা মানে তো বিশ্রাম, এত বছরের পরিশ্রমের পর, পরিশ্রান্ত শরীর মন কে বিশ্রাম দেওয়া। ডাক্তার দের ক্ষেত্রে যদিও রিটায়ারমেন্ট ব্যাপারটা অনেকটাই ভোলাটাইল, যতক্ষণ সুস্থ আছ, রোগী দেখা থেকে বিরত থাকা খুবই কঠিন। তবে, অবসর প্রাপ্ত মানুষজন দেখলে আমার তো ভাই হিংসে হয় আজকাল, কি মজা বলত, ধরা বাধা রুটিন থেকে ছুটি। যা হোক, বেশি ভেব না এসব নিয়ে, আনন্দে থাক রসময়, দেখবে আবার নিজের নিয়মেই ঘুম ফিরবে”।

বুধবার রসময় বাবুর অফ ডে। কিন্তু বুধবার সকাল সকাল তিনি বাড়ি থেকে বের হন, ন্যাশনাল লাইব্রেরী তেই সারাটা দিন কাটান নানা রকম বই নিয়ে নাড়াচাড়া করে। তারপর কলেজে একবার ঢুঁ মেরে বাড়ি ফেরেন সন্ধ্যের দিকে। নিয়ম মেনে আজও তিনি সকাল সকাল বেরলেন কিন্তু গন্তব্য বদলে একটা ক্যাব ধরে সোজা গিয়ে নামলেন শিয়ালদা, কাউন্টারে দাড়িয়ে টিকিট কেটে উঠে বসলেন শান্তিপুর লোকালে। কিছুদিন থেকেই মন টানছিল, বলব বলব করেও গিন্নী কে বলা হয় নি, অবশেষে হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে বেরিয়েই পড়লেন। কলেজ জীবনের বন্ধু জগদীশ আজ প্রায় বছর দশেক হোল শান্তিপুরে বাপের ভিটেতে নিজের মত করে দিন যাপন করছে। বহু বছর বিদেশে থেকে, পর্যাপ্ত টাকা করি দুহাতে উপার্জন করে তারপর একদিন সব ছেড়ে ছুড়ে তিনি নিজের গ্রামে ফিরে আসেন, বাপের এক মাত্র সন্তান হিসেবে বাড়ি ঘর সমেত প্রায় দু

একর জায়গা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে সেখানে থাকতে শুরু করেন। পিতৃদেব কে শেষ বয়সে কিছুদিন দেখভাল করতে পারলেও জগদীশ বাবুর অনুশোচনা যায়নি তাঁর প্রতি দায়িত্ব কর্তব্যে গাফিলতি থেকে গেছে মনে করে। অকৃতদার জগদীশ অনেক বার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন রসময় বাবু কে তাঁর শান্তিপুরের ভিটেতে ঘুরে যাওয়ার জন্যে। নানা কাজে যাওয়া হয়ে ওঠেনি রসময় বাবুর। এতদিনে হুট করে বেরিয়ে পড়তে পেরে বেশ ভালো লাগল।

তারাসুন্দরী কে নিয়ে যাওয়ার কথা প্রথমে মনে হয় নি, পরে মনে হোল তাঁকে সঙ্গে নিলে খারাপ হত না, শহর থেকে দূরে, মাটির ঘ্রাণ আর সবুজের আহ্বানে সারা দিয়ে একটু অন্য রকম ভাবে দিন টা কাটানোর মজা কিছু কম নয়। তবে তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিলে তারাসুন্দরী যেতে সম্মত হতেন কিনা তা নিয়ে রসময় বাবুর সংশয় আছে। এই ভালো, চটপট ঘুরে আসা যাবে ঝাড়া হাতপায়ে। জানলার ধারের একটি সিট বাগিয়ে হাওয়া খেতে খেতে চললেন রসময় কিন্তু খানিক পরে লক্ষ্য করলেন, এই সময় যেটা অবধারিত ছিল, তা কিন্তু হোল না, ট্রেন হেলতে দুলতে দমদম ছাড়তে না ছাড়তেই রসময় ঘুমে ঢুলে পড়বেন সেটাই স্বাভাবিক ভাবে হওয়ার ছিল কিন্তু বাস্তবে রসময় জেগে রইলেন, ড্যাব ড্যাব করে দেখতে থাকলেন রেল লাইনের ধারে ধারে ঝুপড়ি তে চলমান জীবনের দিনপঞ্জি, গরিমার ইতিহাস বুকে নিয়ে নিথর দাড়িয়ে থাকা ভগ্ন প্রায় কারখানার অংশ বিশেষ আর ব্যস্ত জীবনের নানা ছবি। একে একে সোদপুর, ব্যারাকপুর, নৈহাটি, কল্যাণী পেড়িয়ে শান্তিপুরে যখন পৌঁছন গেল, তখন সূর্য মধ্য গগনে।

স্টেশন থেকে রিক্সায় চড়ে বসলেন রসময়, মিনিট পনেরো কুড়ি এ গলি সে গলি ঘুরে জগদীশ বাবুর ডেরায় এসে থামল ত্রিচক্র যানটি। লোহার গেট পেড়িয়ে ভিতরে ঢুকলেন রসময়। অসম্ভব মনোরম পরিবেশে বিশাল জায়গা জুড়ে ফুলের বাগানে নানান রকমের ফুলের সম্ভার দেখে খুশিতে মন ভরে উঠল তাঁর। কাঁকর বিছানো নুড়ি পথ বাগানের মাঝ বরাবর গিয়ে উঠেছে একটি ছোট্ট একতলা বাড়িতে। একতলা বাড়ির ঠিক পিছনে, পনেরো-বিশ ফুট দূরেই রয়েছে একটি দোতলা দালান বাড়ি, একসাথে অনেকের থাকার ব্যবস্থা আছে দেখলেই আন্দাজ করা যায়। রসময় বন্ধ দরজায় কলিং বেলে চাপ দিলেন। খানিক পরেই বেরিয়ে এলেন জগদীশ, প্রথমে কিছুটা হকচকিয়ে গেলেও সামলে নিলেন, তারপর দুই হাত প্রসারিত করে জরিয়ে ধরলেন এত বছর পরে দেখা হওয়া বন্ধুকে। খুব সাদামাটা জীবন যাপনে অভ্যস্ত জগদীশ রসময় কে এতদিন পরে কাছে পেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়লেন। সবসময় সঙ্গে থাকা যদুগোপাল কে ভাত চাপাতে বলেও নিজেই রান্নাঘরে ঢুকে পড়লেন কি রান্না হয়েছে দেখতে। যদু আশ্বস্ত করলেও তাঁর চিন্তার শেষ নেই বন্ধুবরের যত্ন আত্তি নিয়ে। দুই বন্ধুতে অনেক গল্প হোল, তারপর খাওয়াদাওয়া। ঘি ভাত আর বেগুন ভাজা, সাথে আলু পটলের ডালনা আর ছোট মাছের ঝোল, শেষ পাতে টক দই। রসময় যেন কত দিন পর এত আনন্দ করে দ্বিপ্রাহরিক আহার করলেন। জগদীশ বার বার আক্ষেপ করলেন কেন রসময় তারাসুন্দরী কে নিয়ে এলেন না।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে জগদীশ তাঁর সাম্রাজ্য ঘুরিয়ে দেখালেন রসময় কে। আড়ালে থাকায় চোখে পড়েনি, পিছনের দোতলা দালান বাড়িটাকে বাঁ হাতে রেখে কিছুটা এগোলেই রয়েছে একটি ছোট্ট মন্দিরের আদলে তৈরি ভবন। জগদীশ ঘুরিয়ে দেখালেন তাঁর আশ্রম। দুটি ঘরের একটি প্রার্থনা গৃহ আর একটি ছোট্ট লাইব্রেরী আর বসে পড়াশোনা করার কিছু চেয়ার টেবিল। প্রার্থনা গৃহে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তির সামনে বসে কিছুটা সময় ব্যয় করলেন রসময় বাবু। অনাবিল আনন্দে মন প্রাণ ভরে উঠল তাঁর, অভূতপূর্ব শান্তিতে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল হৃদয়। দোতলা দালানের ওপর নীচ মিলিয়ে প্রায় দশ বারোটি ঘরে থাকার ব্যবস্থা পঁচিশ জন দুস্থ মেধাবী ছাত্রের। তিন চার জন অনাথ শিশুও জগদীশ বাবুর স্নেহের ছায়া আর সুচারু শিক্ষার বাতাবরণে বেড়ে উঠছে এখানে। রসময় অভিভূত হলেন বন্ধুর এই কর্মকাণ্ড চাক্ষুষ করে, নতুন করে উপলব্ধি হোল, মানবতা, মনুষ্যত্ব এই সব এখনও বেঁচে রয়েছে মানুষের অন্তরে, ঘৃণা, দ্বেষ, মিথ্যাচার সব কিছু এখনো গ্রাস করতে পারেনি। সারাদিন জগদীশ বাবুর সাথে কাটিয়ে, বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে ফিরে এলেন

রসময়। রাতে রসময় বাবুর দারুণ ঘুম হোল, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নও দেখলেন আগের মত। আবছায়ায় দেখলেন অনেক কিছুই, শেষে দেখলেন এক দারুণ দীপ্তময় পুরুষ, মুখ দেখা যায় না পিছনের আলোক ছটায়, গেরুয়া বসন যেন ঠিক স্বামীজির মতন করে শরীর আবৃত করে রেখেছে তাঁর, রসময় কিছু বলতে চাইলেন সেই দৃপ্ত ভঙ্গিমায় দাঁড়ানো সন্ন্যাসীকে, প্রণাম করতে ইচ্ছে হোল তাঁর পদ যুগল স্পর্শ করে কিন্তু কিছুই করা হোল না, ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসলেন তিনি। ভোরের আলো পৃথিবীর মাটি ছুঁয়েছে কিছু আগেই। রসময় বাবু শ্রদ্ধাবনত মন নিয়ে উঠে বসলেন। তারাসুন্দরী কে ডেকে তুললেন ঘুম থেকে।

ডাইনিং টেবিলে রসময় বাবুর ঠিক উল্টো দিকে বসে কাপে চা ঢেলে কত্তার সামনে এগিয়ে দিলেন তারা সুন্দরী, বললেন, "কাল সঞ্জুর একটা চিঠি এসেছে, একসাথে বসে পড়ে দেখব বলে আর তখন খুলিনি, এদিকে তুমি রাত করে ফিরলে, অত রাতে আর..."

"চিঠি তো খুব বড় একটা দেন না তিনি, দেখ কি লিখেছে, বাপ মাকে চিঠি লেখার মত সময় বের করেছে মানেই তো বিরাট ব্যাপার", ব্যঙ্গ করেন রসময়, বলেন, "তবে চিঠি পড়ার আগে তোমাকে একটা কথা বলা দরকার, একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সে ব্যাপারে, তোমার জানা দরকার"।

তারা সুন্দরী কিছুটা হকচকিয়ে যান, সহজ সরল মানুষটাকে হঠাৎ অপরিচিত লাগে, কিছুটা সংশয় নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কি সিদ্ধান্ত আবার? কাল রাতে তো ভালোই ঘুম হোল" ।

"হ্যাঁ, ঘুম ভালো হয়েছে। সিদ্ধান্তটা নিলাম আজ সকালে। বিরাট কিছু নয়, তবে গুরুত্বপূর্ণ বটে। আমার চাকরির মেয়াদ তো ফুরিয়ে এলো, অবসর কালীন প্রাপ্তি যোগ নেহাত কম নয়, পেনসন যা পাব তাতে খরচা করেও বেশ কিছু অর্থ সাশ্রয় হবে তাতে সন্দেহ নেই। ভাবলাম এককালীন যে টাকা পাব, খুব কম হলেও ষাট পঁয়ষট্টি লাখ তো হবেই, তার অর্ধেক রামকৃষ্ণ মিশনে দেব। আমি চাই মানবিক কাজে আমার উপার্জিত অর্থ ব্যবহৃত হোক। এর থেকে উত্তম কোন পন্থা আছে বলে মনে হয় না। আশা করি তোমার কোন আপত্তি নেই এতে"।

তারা সুন্দরী কোন প্রত্যুত্তর করেন না, সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়েন শুধু। কিছুটা উৎকন্ঠা আর কিছুটা গর্ব ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকেন রসময় এর দিকে। বিস্ময় কাটলে বিদেশ থেকে আসা ভারী খাম টা এগিয়ে দিলেন রসময় কে, ছেলেটা কি লিখেছে জানার জন্য মায়ের মন ছটফট করে ওঠে।

রসময় খামটা ছিঁড়ে সাদা কাগজে লেখা চিঠি বের করে পড়তে শুরু করলেন, নীল কালির ডট পেনে লেখা চিঠি তে সঞ্জয় লিখেছেঃ "শ্রীচরণেষু মা, ফোনে সব কিছু গুছিয়ে বলতে পারব না বলে চিঠি লিখছি। জানি আমার একের পর এক সিদ্ধান্তে বিব্রত হয়েছ তোমরা, প্রথমে এই দেশে থেকে যাওয়া তারপর জেরিনা কে বিয়ে করা। দেশের মানুষের সেবা করা বা দেশ মাতৃকার ঋণ শোধ করার ব্যাপারে বাবার সাথে আমার কনসেপ্ট মেলে না সেটা তোমার অজানা নয়। যেখানে কাজের সুবিধা বেশি, শ্রমের বিনিময়ে বেশি পারিশ্রমিক মেলে সেখানেই কৃতি মানুষের স্বর্গ হবে এতে খুব অবাক হবার কিছু নেই। এখানে আমার মত প্রচুর ভারতবাসী রয়েছেন যারা রীতিমত জাঁকিয়ে বসেছেন মার্কিনীদের সাথে পাল্লা দিয়ে, ওদের নাকে ঝামা ঘষে। এখানে সেটেল করা বা একজন যোগ্য মার্কিন মেয়ে কে বিয়ে করার সাথে দেশ কে ভালোবাসা না বাসার কোন সম্পর্ক যে নেই এই সহজ সত্যটা বাবা কোনদিনই বুঝবে না। হ্যাঁ, তোমাদের প্রত্যাশা মত অনেক কিছুই যে করতে পারিনি তার জন্য তোমাদের অভিমান হওয়াটা হয়ত স্বাভাবিক, যদিও এখন আমার আর এই ব্যাপারে খুব কিছু করার নেই, সময় কে তো পিছনে ফেরানো যায় না। দেখা হলে বুঝতে পারবে, জেরিনা এমনিতে খুব ভালো মেয়ে, যেমন লেখাপড়ায় তেমনি স্বভাবে, ব্যবহারে। ও নিজেও একজন ভালো ডাক্তার, তার থেকেও বেশি ইম্পরট্যান্ট, খুব ভালো মনের মানুষ। ওর ব্যাপারে তোমাকে কিছু কিছু আগেও বলেছি, এখানে সে সব লিখে সময় নষ্ট না করে আসল কথায় আসি।

মাস তিনেক আগে আমরা শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম একটা কনফারেন্সে, সময় বের করে ঘুরতে গিয়েছিলাম শিকাগো আর্ট ইন্সটিটিউটে। স্বামীজির ব্যাপারে খুব কিছু জানা ছিল না জেরিনার, ওখানে স্বামীজির বক্তৃতার কিছু অংশ শোনার সুযোগ হয়েছিল সেদিন আর জেরিনা খুব ইম্প্রেসড হয়েছে স্বামীজির শিকাগো সম্মেলনে যোগ দেওয়া, তাঁর জীবন দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে জেনে। এর মধ্যেই স্বামীজি কে নিয়ে বেশ কিছুটা পড়াশোনা করে ফেলেছে ও এবং বলতেই হচ্ছে স্বামীজির ভাব ধারা বা তাঁর কাজের প্রতি খুব অনুরক্ত হয়েও পড়েছে। ভারতবর্ষ নিয়ে এমনিতেই ওর উৎসাহ বেশ চোখে পড়ার মত। ওর বাবা নাকি ভারতবর্ষের আধ্যাত্মবাদ নিয়ে খুব উৎসাহী ছিলেন যেটা সম্ভবত ওর মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে বুঝতে পারছি।

তবে, ওর পাল্লায় পড়ে বোধহয় আমার জীবন দর্শনেও কিছু পরিবর্তন আসছে। আজকাল খুব মনে হয়, ভিনদেশী জেরিনা ভারতবর্ষ নিয়ে যদি এতটা উৎসাহিত হতে পারে তাহলে আমি কেন ফেরার কথা ভাবব না, কাজের সুযোগ তো ওখানেও আছে। গত কিছুদিন ধরে অনেক ভাবনা, আলোচনা, তর্ক বিতর্কের পর আমরা ঠিক করেছি কোলকাতায় ফিরব, পাকাপাকি ভাবে, হ্যাঁ মূলত জেরিনার ইচ্ছেতেই। মার্কিন মুলুক ছেড়ে, প্রতিষ্ঠিত জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে ইন্ডিয়া যাওয়ার ব্যাপারে ওর এই জেদের কোন ব্যাখ্যা চট করে দেওয়ার সাধ্য আমার নেই। অন্তরাত্মায় কোথায় মানুষের কি ঘটে যায় সে উত্তর তো বিজ্ঞান দিয়ে দেওয়া যায় না। আপাতত কোলকাতার একটি সংস্থায় যোগাযোগ করেছি, ওখানেই জয়েন করব, জেরিনা ওর পছন্দ মত যেরকম চাইবে করবে। এখানকার কাজ কর্ম শেষ করে পাকাপাকি রিলিজ নেওয়ার আগে গ্রিন কার্ড সারেন্ডার করতে হবে, গাড়িটাও বিক্রি করতে হবে। টুকিটাকি আরও কিছু কাজ সেরে ফিরব। বাবা কে জানিও, আমরা ফিরছি, যদি সম্ভব হয় এয়ারপোর্টে এসো, অনেকদিন দেখিনি তোমাদের। সাবধানে থেকো... তোমার সঞ্জু।

রসময় বাবু চিঠি পড়া শেষ করে তাকালেন তাঁরাসুন্দরির দিকে, চোখে বিস্ময় আর উচ্ছ্বাস উপচে পড়ছে তাঁরাসুন্দরির। রসময় দেখলেন, তাঁর স্ত্রীর চোখের কোনে এক ফোটা মুক্তা বিন্দু। দুজনেই কোন কথা খুঁজে পেলেন না, শুধু তাকিয়ে রইলেন একে অপরের দিকে।

দমদম এয়ারপোর্টে ঢোকার আগে পর্যন্ত তারাসুন্দরী কোন কথা বলেননি। শুধু মাঝে মাঝে হাতের ঘড়িতে সময় দেখেছেন আর ড্রাইভার কে নির্দেশ দিয়েছেন তাড়াতাড়ি ড্রাইভ করতে, যানজটে বেশ কিছুটা বাড়তি সময় লেগে গেল এই টুকু রাস্তা পেরোতে। ইন্টারন্যাশনাল টার্মিনালে পৌঁছে গাড়ি থেকে নামার সময় রসময় কে ডেকে তুললেন তারাসুন্দরী, মানুষটার ঘুম ফিরেছে দেখে মনে মনে শান্তি পেয়েছেন তিনি, গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, "ছেলে বৌমাকে রিসিভ করতে হবে তো নাকি গাড়িতে বসে ঘুমবে? কি ঘুমরে বাবা, ওঠ, নামতে হবে!" গাড়ির দুলুনিতে বেশ ঘুম হয় রসময়ের, আজ আরও একটু বেশিই গাঢ় হয়েছে ঘুমটা। আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে বসলেন রসময়, তারপর দুজনে এগিয়ে গেলেন এক্সিট গেটের দিকে।

সুদীপ সরকার,

অতিরিক্ত জেলাশাসক, পূর্ব মেদিনীপুর ।প্রশাসনিক গুরু দায়িত্ব সামলেও কিছুটা সময় বের করে সামান্য কিছু লেখালেখি করি মনের তাগিদে, এর আগে, রবিবাসরীয় আনান্দবাজার, দৈনিক স্টেসম্যান, আজকাল, সানন্দা (ওয়েব) এবং পরবাসে আমার লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

চৈতালি সরকার

কামড়

শেষপর্যন্ত বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল সুভাষ । ঠিক যেন পিঁপড়ের কামড়! ঘাড় থেকে পাঁচ আঙুল নেমে শিরদাঁড়ার ডান দিকের ফোলা অংশে। কখনো বাঁদিকে, শিরদাঁড়ার দুপাশে কাঁথা স্টীচের বুনন।

কয়েকদিন ধরেই এইরকম চলছে। রাত সাড়ে এগারোটায় দু ঢোক জল খেয়ে সুভাষ শরীরটা এলিয়ে দেয় বিছানায় । কিছুক্ষণের মধ্যেই ফোল্ডিং ছাতার মতো গুটিয়ে নিতে হয় নিজেকে । অনেকবার বিছানার চাদর ঝেড়ে দেখেছে, পিঁপড়ে, বোলতা কোনো কিছুই নেই। তবু বিছানায় শুতে পারছে না। কারণ সেই কামড়! একবার নয়, দুবার নয়, বারবার। চিন্তার মাটি খুঁড়ে মস্ত পুকুর বানিয়ে ফেলেছে। তবু কোনো সুরাহা হয়নি। মাঝে মাঝে ওর মনে হয় অদৃশ্য কোনো বস্তুর কাজ নয় তো!

মাথার মধ্যে দিনরাত এতো প্রশ্ন কুচো চিংড়ির মতো কিলবিল করলে কারোর পক্ষে কি স্থির থাকা সম্ভব! সাতদিন হয়ে গেল সুভাষের চোখে ঘুম নেই। অফিসের ইজিচেয়ারে চোরা ঘুম কিছুটা হলেও, এভাবে কি জীবন কাটে!

সুভাষ ঠিক করল ব্যাপারটা কাউকে খুলে বলবে। মনের অশান্তি প্রকাশ করলে নাকি শান্তি পাওয়া যায়। কিন্তু কাকে বলবে? এই নিয়ে অফিসে যদি মুখরোচক কিছু শুরু হয়। আর তারপর হাসাহাসি। এমনিতেই ওর পিছনে লেগে থাকে দাসদা, মুখার্জীদা। বোসদা অবশ্য একটু অন্যরকম। বিপদে পাশে পাওয়া যায়। তবে কি বোসদাকে বলবে!

টেবিলের সামনে অগোছালো কাগজের ওপর চোখ বুজে এসেছিল, মুখার্জীদার ডাকে আধফোটা চোখে তাকাল সুভাষ । উনি বললেন, " তোমার কি শরীর খারাপ? তোমাকে এরকম লাগছে কেন?"

একে একে সবাই এসে সুভাষকে ঘিরে ধরল। সত্যি চোখ মুখের অবস্থা ভালো নয়। বেশ সিরিয়াস ব্যাপার। মুখার্জীদা বললেন, " ভালো ডাক্তার দেখাও। প্রেশারটা ঠিক আছে তো? "

পাংশু মুখে সুভাষ বলল, "ডাক্তার! "

শুধু দাসদাই বললেন," কি ভায়া প্রেমে পড়োনি তো? প্রেমে পড়লে এইরকম কিন্তু হয়।"

সুভাষ একবার প্রেমে পড়েছিল বটে। সে কলেজ লাইফের কথা। নিবেদিতাকে আদর করে সুভাষ নিবু বলত। ওর মেসের সামনে একতলা বাড়ির ছাদে ঠিক আড়ে আটটায় নিবু কাপড় মেলতে আসত। ঐ সময় জানালায় বই খুলে বসে থাকত সুভাষ। চার চোখ এক হলেই নিবুর লাজুক মুখে ফুটে উঠত হাসি। আর এই হাসিটুকুর জন্যই ও সেবার গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি যেতে পারেনি। বলা যায়না ঠিক আড়ে আটটায় মেসের অন্য কারোর সাথে নিবুর চোখাচোখি হতে পারে! সেদিন এতটা রিস্ক নিতে পারেনি সুভাষ।

আর গ্রামের বাড়িতে আছেই বা কি! ছোটবেলায় মাকে হারিয়ে আসল মায়ের মুখ তো মনেই নেই । বাবা আবার বিয়ে করলেন। সুভাষের কথা ভাববার আছেই বা কে! একজন অবশ্য ছিল। কামিনী। ছোটবেলার খেলার সঙ্গী। তাই বলে নিবুকে ছেড়ে কামিনীর কাছে যাওয়ার মানেই হয়না। কোথায় নিবু আর কোথায় কামিনী!

একদিন কামিনী বায়না করে বলেছিল, "সুভাষ দা একবার শহরে নিয়ে যাবে? আমার খুব যেতে ইচ্ছে করে। "

সুভাষ সেদিন বিজ্ঞের মতো বলেছিল, "ইচ্ছে তো অনেক কিছুই করে, সবার সব ইচ্ছে কি পূরণ হয়!" নিবুর কথাটা ইচ্ছে করে সেদিন কামিনীকে বলেনি। সুভাষের মনে হয়েছিল এখনই বোমা না ফাটানোই ভালো।

একদিন কলেজ যাওয়ার পথে দেখা হল নিবুর সাথে। প্রথমটা চিনতে পারেনি সুভাষ । নিবুই এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল," আপনি রোজ ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকেন কেন? "

"না, মানে হ্যাঁ। মানে ইয়ে ওই সময় আমি একটু পড়া করি ।" সুভাষের জড়িয়ে যাওয়া কথায় হেসে উঠল নিবু। আর ঐ হাসি দিয়েই শুরু! তারপর? ভিক্টোরিয়া, নন্দনকানন, গড়ের মাঠ চষে বেরিয়েছে দুজন। সুভাষের প্রেমকাহিনী পাকা কাঁঠালের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল মেসে।

গ্রাম থেকে নিতাইদা এসেছিলেন। নিতাইদা শহরে কিসের যেন ব্যবসা করেন। তার কাছ থেকেই জানতে পারল বাবার শরীর বিশেষ ভালো নেই। পরীক্ষা সামনে তাই ছেলেকে ফোনে কিছু জানাননি বিলাসবাবু। হঠাৎ সুভাষের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। অভিমানও হল। ও কি তাহলে পর হয়ে গেছে। অন্যের কাছ থেকে শুনতে হচ্ছে বাবার শরীর খারাপ। পরক্ষণেই মনে হল ও নিজেও তো কখনো বাবার খবর নেয়নি। হয়তো বাবার মধ্যেও রয়েছে একই অভিমান। নিবুকে ছেড়ে যাবার কথা ভাবতেই বুকের ভেতরটা হুহু করত। তাইতো বাড়ি যায়নি অনেকদিন। প্রথম প্রথম কামিনীর টানে গ্রামে গেছে। সেই টান কি শুধুই বন্ধুত্বের! তলিয়ে দেখেনি সুভাষ। নিবু আসার পর সেই টানেও ভাটা পড়তে শুরু করেছিল।

"প্রেমের কথা বলতেই তুমি যে মুষড়ে পড়লে দেখছি।" দাসদা টুকরা হাসি হেসে বললেন। তাইতো কোথায় তলিয়ে গিয়েছিল সুভাষ। তিনবছর আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে কেন উসকানি দিচ্ছে! না, কিছুতেই ভাববে না। এখন একটা জিনিসই ভাববে তা হল বিশুদ্ধ ঘুমের কথা। যা গত সাতদিন ধরে চোখের অন্তরালে আছে।

বোসদা সব শুনে গম্ভীর মুখে বললেন, " বিষয়টা তো সাংঘাতিক মনে হচ্ছে। " একটু ভেবে বললেন, " আচ্ছা স্বপ্ন নয় তো? এই ধরো তুমি ঘুমের মধ্যে পিঁপড়ের কামড় খাচ্ছ আর ..."

কথাটা থামিয়ে দিয়ে সুভাষ নিরস মুখে বলল, "ঘুম জিনিসটাই কর্পূরের মতো উবে গেছে দাদা। ঘুম যেখানে নেই স্বপ্ন আসবে কোথা থেকে?"

একটানা সতের থেকে উনিশ ঘন্টা না ঘুমালে মদ্যপান করা লোকের মতো মাথা কাজ করে। সুভাষ ভাবল তবে কি ওর অবস্থা সেরকম হয়েছে। হয়তো কথার মধ্যে অসংগতি আসছে।

না সেরকম কিছু হয়নি। সুভাষ সহজেই নিবুর সব কথা মনে করতে পারছে। ওর পরিষ্কার মনে পড়ল পনেরো দিন পর যখন গ্রাম থেকে ফিরেছিল নিবু যেন সম্পূর্ণ অচেনা মেয়ে। ফোনের মধ্যে ছিল দায়সারা ভাব। বাবাকে হারিয়ে ওর একমাত্র আশ্রয় ছিল নিবু। কি করে বোঝাবে ওকে ছাড়া একমুহূর্ত বাঁচতে পারবে না সুভাষ। অথচ ও বুঝতে পারছিল, নিবু কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে!

মেসের দীপক প্রথম নিবুর বিয়ের খবরটা দিয়েছিল। প্রথমে বিশ্বাস করেনি সুভাষ। মনে হয়েছিল নিশ্চয় দীপকের শুনতে ভুল হয়েছে । কিন্তু যেদিন একতলা বাড়িটা থেকে সানাইয়ের সুর ভেসে এল, বুঝতে অসুবিধা হয়নি নিবুর সরে যাওয়ার কারণ। দীপক রসিয়ে রসিয়ে বলেছিল, "ডাক্তার ছেলে।" নিবুর নিশ্চয় খুব পছন্দ হয়েছে। কোথায় ডাক্তার কোথায় একজন বি. এ পড়ুয়া! তাই বলে নিবু একবার জানাল না। জানালে সুভাষ কি বিয়েতে বাধা দিত! ও কি ছেলেমানুষি করে বলত, " আমায় ছেড়ে যেও না।"

কিজানি হয়তো ছেলেমানুষি করেই ফেলত!

আবার অতীতে তলিয়ে যাচ্ছে সুভাষ। ও সেদিন গুগল ক্লিক করে দেখছিল টানা এগারো দিন না ঘুমোলে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে, ইলিউশন শুরু হয়। সাতদিন কেটে গেছে হাতে মাত্র চারদিন আছে। তার আগেই কি ইলিউশন শুরু হবে!

বোসদার সঙ্গে ডাক্তারের কাছে গেল সুভাষ। নামকরা নিউরোলজিস্ট ডঃ ত্রিপাঠি। সব শুনে বললেন, " আপনি শিগগির একটা বিয়ে করুন।

তাহলেই আপনার সমস্যা মিটবে।" এতো বড় ডাক্তারের কাছে এটা প্রত্যাশা করেনি ও।

দাসদা, মুখার্জীদা তো একথা প্রায়ই বলেন। এই কঠিন সময়ে ডাক্তার কোনো ওষুধ দিলেন না। শুধু বললেন বিয়েটাই একমাত্র ওষুধ।

বোসদা খুব সিরিয়াস ভাবে বললেন, " পাত্রী দেখব নাকি? " সুভাষ বলল, " এত তাড়াতাড়ি কি করে সম্ভব? " ওর মনে হল মাত্র চারদিনের মধ্যে সব ঠিক করা অসম্ভব। টানা এগারো দিন হলেই তো সব হাতের বাইরে চলে যাবে। আর নিবুর স্মৃতি কি করে এতো সহজে মুছে ফেলবে! বোসদা একটু ধাক্কা দিয়ে বললেন, " এতো ভাবছ কি? ডাক্তার যখন বলেছেন নিশ্চয় কোনো কারণ আছে। তুমি বরং বিয়ের জন্য তৈরি হও।"

অনেকদিন পর কামিনীর কথা মনে পড়ল সুভাষের। ওর মনে হল কামিনী কি ওকে ভালবেসেছিল! কোনোদিন তো বলেনি। ও কামিনীর টানে গ্রামে গেছে ঠিকই। হতেই পারে বন্ধুত্বের টান। গ্রামে বন্ধু বলতে কামিনী ছিল। তাই হয়তো দেখা করতে ইচ্ছে করত। এতদিনে নিশ্চয় নিবুর মতো সংসারী হয়ে গেছে কামিনী। সুভাষের ভীষণ অভিমান হল। কামিনী একবার জানাল না পর্যন্ত। ফোন করতে পারতো। অবশ্য নতুন নম্বর ও জানেনা। তাতে কি হয়েছে? গ্রাম থেকে প্রায়ই নিতাইদা আসেন। নিতাইদা সুভাষের নতুন ঠিকানা জানেন। কামিনী ইচ্ছে করলেই বিয়ের কথা জানিয়ে চিঠি দিতে পারত। তবে কি নিবুর মতো কামিনীও গোপন রাখতে চেয়েছিল সব! সেই বৃষ্টির মধ্যে দুজনের ভাঙা বাড়িতে আশ্রয়। ভেজা চুলে আঙুলের ছোঁয়া! সুভাষ নিজের মনেই হেসে উঠল।এতদিন পর ও আজ কেন ভালবাসার গন্ধ খুঁজতে চাইছে! কোনো দিন নিবুর জায়গায় কামিনীকে বসাতে চায়নি । নিবু চলে যাওয়ার পর অনেক রাত্রি জেগেছে। কই একবারও তো কামিনীর কথা ভাবেনি! মনে হয়নি গ্রামে ফিরে যাই। মনে হয়নি কামিনী তো আছে। সেদিন শুধু মনে হয়েছিল সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। দেশবিদেশ ঘুরে বেড়াবে। কখনও নিবুকে ভুলতে পারবে না।

মুখার্জীদার হস্তক্ষেপে বাধ্য ছেলের মতো সুভাষ বিয়েটা করেই ফেলল। দাসদা গোলাপ দিয়ে বিছানা সাজালেন। অফিসের কলিগদের জন্য ছোট করে একটা পার্টির ব্যবস্থা করা হল। সব দায়িত্বই ছিল বোসদার ওপর। সব ঠিকঠাক করতে এক মাস লেগে গেল। সুভাষের মস্তিষ্ক ঠিকই আছে। এই কয়েকদিন ও গ্রামের বাড়িতে ছিল। বিয়ের অনুষ্ঠান ওখানেই হয়েছে। বন্ধুদের আবদারে ফুলশয্যাটা কলকাতায় করতে হচ্ছে।

ফুলশয্যার রাতে দরজা বন্ধ করে সুভাষ দেখল খাটের ওপর লম্বা ঘোমটা টেনে কামিনী বসে। এবার সত্যিই হাসি পেল ওর। এতদিন ধরে সুভাষের অপেক্ষা করেছে কামিনী। শুধু একটা ফোনের জন্য এতগুলো বছর!

সুভাষ কাছে এসে কামিনীর ঘোমটা তুলে বলল, "আমার কাছেও লজ্জা? " কামিনী আর সেই গ্রামের ছোট্টটি নেই। রাঙা বউয়ের মতো বলল, "যা"!

দুজনে বেশ কাছাকাছি এসে প্রেম গদগদ হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। কি মুশকিল আবার সেই কামড়। এবার দুজনকে একসাথে। কামিনী গ্রামের মেয়ে সহজে হার মানবে না। কামড়ের উৎস খুঁজতে লেগে পড়ল কোমর বেঁধে। চাদর তোশক সরিয়ে তেলচিটে গদির ওপর ঝাঁটার সপাসপ ঘা মারতেই পিলপিল করে বেরিয়ে এল গোটা দশ পনেরো ছারপোকা। হো হো করে হেসে উঠল সুভাষ। শেষপর্যন্ত ছারপোকা!

নিবু আলোতে কামিনীকে কাছে টেনে সুভাষ বলল, " অনেকদিন পর বেশ শান্তি লাগছে। ভাগ্যিস বিয়েটা করলাম। " কামিনী ছোট্ট একটা নিশ্বাস চেপে বলল, " আমি জানতাম তুমি একদিন আমার হবেই। "

সুভাষের মনে হল শুধু কি পিঠেই ছারপোকার কামড় খেয়েছে, বুকের কাছে কি কিছুই কামড়ায়নি। এতদিন শুধু তোষকে নয় মনের মধ্যে ছারপোকা বাসা বেঁধেছিল। আজ পিষে মেরেছে সব পোকামাকড়। কামিনী ফুলের গন্ধে ভরে উঠেছে ঘর।

অনেকদিন পর একটা আস্তো ঘুম, উঃ কি পরম পাওয়া!

চৈতালি সরকার

বর্ধমানের অন্তর্গত বিল্বেশ্বর বিনোদীলাল বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স। কবিতা, গল্প লেখা নেশা।

প্যারাসাইট
দেবতোষ ভট্টাচার্য

সদ্য কেনা নতুন জুতোখানা আলতো করে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছিলেন নগেনবাবু। কয়েকদিন ধরেই খেয়াল করছিলেন জুতোজোড়া, হাত জোড় করে ঠিক নমস্কারের ভঙ্গিতে ঝুলছিল বুড়ো জনের দোকানে - সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ছে তার কালো কুচকুচে নরম শরীরে, আদুরে গলায় যেন কাকুতি-মিনতি করছে একটিবার পায়ে এসে বসার। শেষমেশ সেদিন বাজার থেকে ফেরার সময় কিনেই ফেললেন জুতোখানা, দামটাও বেশ কমই পড়ল – ২৯৯ টাকা। দোকানের মালিক জন ডিসুজা, নিজের হাতেই নাকি বানিয়েছে এই জুতোখানা – আপন সন্তানের মতই পরম মমতায় এক সুন্দর লাল ফিনফিনে কাগজে মুড়ে জুতো-দুটো ঝোলায় পুরে দিলো সে। রোজ বিকেলে বাড়ীর পেছনে গোল পার্কে হাওয়া খেতে যাওয়ার নেশা তাঁর, পা-ঢাকা জুতোখানা পড়ে হাঁটলে বেশ আরাম হবে।

নগেনবাবু আপাদমস্তক কেরানী – গোল টাক-মাথায় মৃদু হাওয়ায় খেলা করছে গুটিকয়েক সাদা চুল। পাতুলিয়া বাজারের কাছেই তাঁর পৈতৃক বাড়ী, স্ত্রী সোমলতা দেবীর সাথে তাঁর বহুদিনের নির্বিবাদ সহাবস্থান। একমাত্র পুত্র সোমেশ - আজ বহুদিন হল সস্ত্রীক দিল্লীতে বসবাস। বছর দশেকের একটি ফুটফুটে মেয়ে আছে ওদের, দাদুর সাথে বেশ অম্লমধুর সম্পর্ক তার। এই গরমের ছুটিতেই তেনারা সদ্য ঘুরে গেছেন – দাপাদাপি, হাঁকাহাঁকির বদলে চারিদিকে তাই এখন শ্মশানের শান্তি। এ বাড়ীটাও জেনে গেছে এতদিনে, চুপটি করে অপেক্ষা করে থাকতে হবে আবার একটি বছর।

নগেনবাবুর মনটা মোটে ভাল নেই আজ। গত কয়েকদিন ধরেই চলছে একঘেয়ে বৃষ্টি, অফিসের আবহাওয়া বিশারদরা অবশ্য দেখেই বুঝেছে, এ লো-প্রেশার না হয়ে যায়না। দুঃখটা অবশ্য নগেনবাবুর অন্য জায়গায়, এই বৃষ্টিতে নতুন জুতোজোড়া বার করার জো নেই – ভিজে চুপসে নেতিয়ে যাবে একেবারে। কিছুদিন পরই বর্ষা ছুটির দরখাস্ত নিয়ে হাজির হল প্রকৃতির দরবারে, ছুটি মঞ্জুর হতেই ড্যাডাং ড্যাং করে পগার পার। নগেনবাবু প্রায় ভুলেই মেরে দিয়েছিলেন সেই জুতোজোড়ার কথা। বিকেলে লাজুক নরম রোদ দেখে বার করলেন সেখানা – ঝেড়ে-ঝুড়ে গলিয়ে নিলেন পায়ে। কেনার সময় ঠিক খেয়াল করেননি, আজ কেন জানিনা পায়ের মাপের চেয়ে একটু বড়ই লাগল জুতোখানা। যাক গে, বলে মচমচ শব্দ তুলে সটান পার্কে ঢুকে পড়লেন নগেনবাবু।

****

বর্ষার ঠিক পরেই চতুর্দিক কেমন সবজে মতন লাগে, মনে হয় এইমাত্র এক পোঁচ রঙ মেরে চলে গেল প্রকৃতি। তাড়াহুড়োতে কোথাও কম, কোথাও-বা একটু বেশী পড়ে গেছে সে রঙ। পার্কে ঢুকে আর বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে হাঁটতে শুরু করলেন তিনি। পড়ন্ত বিকেলের গোলাপি সূর্যটা প্রতিযোগিতায় তাঁকে হারিয়ে দিল যেন, লাফ মেরে সটান লুকিয়ে পড়ল পার্কের লাগোয়া বিশাল বাবলা গাছের পিছনে।

এই পার্কের ঠিক গায়েই রয়েছে খ্রিষ্টানদের এক বহু প্রাচীন কবরস্থান, বর্তমানে অবশ্য পরিত্যক্ত। তবে পরিত্যক্ত হলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এই তো একটু আগেই কেউ তার প্রিয়জনকে একগোছা ফুল দিয়ে গেছে! কেউবা

ওদিকে বিড়বিড় করে এখনো আউড়ে চলেছে প্রার্থনার বাণী – শান্তির ঘুমের ব্যাঘাত না হয়, সে চেষ্টাই যেন সবার। ঝাঁকড়া বাবলা গাছখানা যেন পার্কটাকে আগলে রেখেছে ওপারের সমস্ত অশুভ শক্তির থেকে – তবে রাত্রি নামলে ওদিক পানে চাইলে বুকটা একটু ছ্যাঁত করে ওঠে বৈকি!

চার পাক শেষ করে হাঁপাতে হাঁপাতে হঠাৎই নগেনবাবু লক্ষ্য করলেন মেয়েটিকে – কচি ফ্যাকাসে মুখখানি, টানা টানা দুটি চোখে এক অদ্ভুত বিষাদের ছাপ। মেয়েটির জামা বেশ পুরনো এবং ছেঁড়া, তবে চেহারা দেখে ভাল ঘরের বলেই মনে হল নগেনবাবুর। বেঞ্চের কোনে বসে মেয়েটি অলস-ভাবে একদৃষ্টে চেয়েছিল তাঁর নতুন ঝকঝকে জুতোজোড়ার দিকে। দেখে নিজের নাতনির বয়সীই মনে হল – কি ভেবে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন তার দিকে। মেয়েটি কিন্তু তাঁর দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে একভাবে জুতোটা দেখছিল – যেন জীবনে এই প্রথম সে এরকম কিছু দেখছে। নগেনবাবু আলতো করে শুধোলেন – 'কোন বাড়ীর মেয়ে, তুমি? নতুন নাকি এপাড়ায়!' নাহ, মেয়েটি বোবার মত বসেই রইল। নগেনবাবু ভাবলেন, মেয়েটি নিশ্চই লাজুক প্রকৃতির, অপরিচিত কারোর সামনে সংকোচ বোধ করছে – তাই আর বিরক্ত না করে সেদিনের মত হাঁটা শেষ করে বেরিয়ে এলেন পার্ক থেকে। বাড়ীতে ঢুকে সাবধানে খুলে রাখলেন জুতোজোড়া – নাহ, একটুও টসকায়নি!

নগেনবাবুর রুটিনে কোনও ছেদ পড়ল না - সকালে বাজার, দুপুরে অফিস, আর বিকেলে তাঁর প্রিয় পার্কে হাঁটতে যাওয়া। সেই মেয়েটিকেও আজকাল রোজই দেখেন। দুজনেরই বোধ করি নিঃসঙ্গ জীবন - তাই আস্তে আস্তে তাঁদের মধ্যে বেশ এক বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে লাগল। মারিয়ম, মানে মেয়েটির জন্যই বোধহয় তাঁর পার্কের ডিউটি কামাই করতে একদম ইচ্ছা করত না। আজও ঠিক সময়ই হাজিরা দিয়েছেন, খেয়াল করলেন মারিয়ম সেই এক জায়গায় বসে আছে – একটু বেশীই যেন শুকনো লাগছে আজ ওর গালদুটো। নিজের কাজে গড়িমসি মোটেই পছন্দ নয় নগেনবাবুর, তাই সময় নষ্ট না করে হাঁটতে শুরু করলেন। কেন জানিনা, আজ এক চক্কর মেরেই ক্লান্ত বোধ করলেন তিনি - হয়ত অফিসে একটু বেশীই খাটা-খাটনি গেছে। দু পাক ঘোরার পর শরীর আর দিল না, ধপ করে বসে পড়লেন মারিয়মের পাশে।

"তোমার জুতোটা আমার দারুণ লাগে, আঙ্কল!" মিষ্টি হেসে মন্তব্য করল মারিয়ম। পরক্ষণেই এক অদ্ভুত আবদার করে বসে মেয়েটি –

"একটু পায়ে গলিয়ে হেঁটে আসতে দেবে, খুব মজা হবে!" হেসে ফেলেন নগেনবাবু। তাঁর জুতো পরে এই ছোট্ট মেয়েটির মনে যদি একটু খুশীর ছোঁয়া লাগে, মন্দ কি! জুতোটা খুলতে কিন্তু বেশ কসরত করতে হল তাঁকে, হাজার হাজার শিকড় যেন আঁকড়ে ধরে রেখেছিল পা-দুখানা। অবাক হলেন তিনি – যে জুতো ঠিক ফিট করেনি বলে তাঁর মনে একটু খুঁতখুতি ছিল, সেই জুতো খুলতে গিয়ে আজ এত পরিশ্রম করতে হল কেন? খুব ঘেমে গেছিলেন অবশ্য, কিন্তু তার জন্য.....। অবাক হওয়ার আরও বাকি ছিল - দেখলেন জুতোটা মারিয়মের পায়ে একদম খাপে-খাপে বসে গেল, যেন ওর জন্যই স্পেশাল অর্ডার দিয়ে বানানো। অথচ মেয়েটা তাঁর হাঁটুর বয়সী বললেই হয়! ধীরে ধীরে দু হাত প্রসারিত করে প্রজাপতির মত পাখনা মেলল সে মেয়ে, উড়ে চলল সবুজ ঘাসের ওপর আপন খেয়ালে – না কি বেখেয়ালে! হঠাৎই ঝুপ করে সন্ধ্যে নেমে এলো, মারিয়ম ছুটে এসে ফেরত দিয়ে গেল তাঁর সম্পত্তি। এই প্রথম খিলখিলিয়ে হাসতে দেখলেন তাকে, ফরসা গাল দুটিতে হালকা লালের ছোঁয়া - এই ছোট্ট খুশীই হয়ত ফিরিয়ে এনেছে তাকে সাদা-কালোর ধূসর দুনিয়া থেকে।

মারিয়ম খুব দ্রুত মিশে গেল যেন বাবলা গাছটার পেছনে – একেই বোধহয় বলে হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়া। ওদিক দিয়ে বাইরে যাওয়ার কোনও রাস্তা অবশ্য চোখে পড়ল না নগেনবাবুর। রাস্তার স্ট্রীট-লাইটগুলো জ্বলে উঠছে এক এক করে - আর অপেক্ষা না করে বাড়ী ফেরার পথ ধরলেন তিনি। হাঁটতে হাঁটতেই খেয়াল করলেন জুতোজোড়া আবার আগের মত দিব্যি ঢলঢলে লাগছে – যাক, তার মানে ঘামের জন্যই বোধহয় চেপে বসেছিল তখন জুতোখানা। আজ একটু বেশীই শ্রান্ত মনে হল, এক গ্লাস গরম দুধ খেয়ে গায়ে যেন বল পেলেন। রাত্রি নটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়লেন নগেনবাবু।

পরের দিনও মারিয়ম ঐ এক আবদার করল। আসলে আজ অফিস থেকে ফিরে আর যেতে খুব একটা মন চাইছিল না, তাও বাচ্চা মেয়েটার প্রতি এক অদ্ভুত টান বশতঃ নগেনবাবু হাজির হয়েছিলেন পার্কে। সেই এক বেঞ্চে বসে ছিল মারিয়ম – যেন অধীর আগ্রহে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। মুখটা আবার শুকিয়ে গেছে, কে জানে ভালো খাওয়া দাওয়া বোধহয় জোটেনা ওর। দেখা হতেই বললেন নগেনবাবু – "খাবি কিছু? মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে খাওয়া জোটেনি!"

মারিয়ম বলে উঠল – "পরে খাব'খন, তুমি আজ হাঁটতে গেলে না যে বড়?"
নগেনবাবু ক্লান্তি জড়ান গলায় বলে ওঠেন – "না রে, আজ শরীরটা দিচ্ছে না! তুই হেঁটে আসবি তো নে জুতোটা।"
জিদ ধরে মারিয়ম – "না, আগে একপাক অন্ততঃ ঘুরে এসো তুমি, তারপর! তোমার শরীরের জন্য দরকার, বলে দিলুম!"
তার আদুরে গলার এই শাসনের মর্যাদা রাখতে অগত্যা উঠতেই হল নগেনবাবুকে। এক চক্কর মেরে জুতোটা খুলতে গিয়ে আজও ব্যাপারটা খেয়াল করলেন তিনি – শক্ত করে পায়ে চেপে বসে আছে তারা। মারিয়ম জুতোজোড়া পায়ে গলিয়েই আনন্দে নৃত্য শুরু করে দিল। এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে, ঝটপট জুতোখানা উদ্ধার করে বাড়ীর পথ ধরলেন নগেনবাবু – মুখ ঘুরিয়ে মারিয়মকে ইংরেজি কায়দায় বাই-বাই বলতে গিয়ে খেয়াল করলেন তার ঠোঁটের লাল আভা। পরক্ষণেই মারিয়ম যেন ফের হাওয়ায় মিলিয়ে গেল, বাবলা গাছটার পেছনে হঠাৎ এত কুয়াশা কোত্থেকে এসে হাজির হল কে জানে – আর সেই কুয়াশায় যেন মরণ ঝাঁপ দিল মেয়েটা! হাঁটতে গিয়ে খেয়াল করলেন জুতোখানা আবার সেই আগের অবস্থায় ফিরে এসেছে! ব্যাপারটা ভাবিয়ে তুলল নগেনবাবুকে।

****

দিন দশেক এভাবেই চলল। স্বামী-স্ত্রীর ছোট্ট সংসার, তাই ছোটখাটো পরিবর্তনগুলো যেন একটু বেশীই চোখে পড়ে। সোমলতা দেবী লক্ষ্য করলেন তাঁর স্বামীর স্বাস্থ্য দ্রুত ভেঙ্গে পড়ছে – চোখের কোনে কালি, সেই উৎসাহ-উদ্দীপনা আর নেই, অল্পতেই বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস ইদানীং আর দেখা যায় না বললেই হয়। নগেনবাবুও বুঝতে পারলেন একটুতেই হাঁপিয়ে পড়েন আজকাল – কিন্তু এ কালের নিয়ম, বয়সের বিষাক্ত ছোবল এড়ানো কি আদৌ সম্ভব! তবু গিন্নীর পীড়াপীড়িতে ডাক্তারের কাছে যেতেই হল তাঁকে। ডক্টর সমর বোস তাঁর স্কুলের বন্ধু – তাঁদের মধ্যে আজ অবস্থার বিস্তর ফারাক থাকলেও বন্ধুত্বে কোনোদিন ছেদ পড়েনি। ডক্টর বোস সব দেখে শুনে বললেন –
"হিমোগ্লোবিনটা মনে হচ্ছে কম আছে, একটু অ্যানিমিক লাগছে তোকে। কোনও ইন্টারনাল হেমারেজ আছে কিনা বুঝতে পারছি না – তুই আমায় চিন্তায় ফেলে দিলি রে! আমার নার্সিংহোমে ভর্তি হয়ে যা, কয়েকটা রক্তপরীক্ষা না করে কিছু বলা যাবেনা। কমপ্লিট রেস্ট, তবে দরকার পরলে রক্ত দিতে হতে পারে।"

নার্সিংহোমে ভর্তি? আঁতকে উঠলেন নগেনবাবু। আমতা আমতা করে বললেন –
"ইয়ে...সমর...কয়েকটা ভাল ওষুধ লিখে দে না বাপু, ল্যাটা চুকে যায়! এমন কিছু শরীর খারাপ হয়নি, কথা দিচ্ছি বাড়ী গিয়ে বিছানা থেকে আর উঠবোই না। ঐ ভর্তির ব্যাপারটা ছেড়ে দে প্লীজ...হাতে এখন পয়সাও নেই রে! বাড়ীতে গিন্নী একা খুব টেনশন করবে!"

মুখটা কালো হয়ে যায় সমর বোসের। ভারি গলায় বলে ওঠেন –
"তোর শারীরিক অবস্থা ঠিক কিরকম তা মনে হয় তোর থেকে আমি ভাল বুঝি। আর পয়সা নিয়ে কথা বললে দ্বিতীয়বার এমুখো হবি না – আমি সিরিয়াস!"
অগত্যা! এরপর তো আর কোনও কথা চলেনা! নার্সিংহোমে শেষমেশ রক্তই দিতে হল নগেনবাবুকে। ছাড়া পাওয়ার সময় ডক্টর বোসের কড়া নির্দেশ ছিল – এক মাস বাড়ীর বাইরে বেরোনো বন্ধ। ফলে অফিস আর তাঁর অতি প্রিয় পার্কটাকে জোর করে ভুলেই থাকতে হল কিছুদিন।

মাস-খানেকের মধ্যেই পুরো ফিট হয়ে গেলেন নগেনবাবু – কিছুটা তাঁর অসম্ভব মনের জোর আর বাকিটা স্ত্রী সোমলতা দেবীর হাতযশ। সেই আগের ঝকঝকে ভাব ফিরে আসতেই অফিস জয়েন করলেন আবার। শরৎ বিদায় নিয়েছে, হালকা শীতের আমেজ চারিদিকে – ভোররাতে হিম পড়ছে প্রায় রোজই। আজ আবহাওয়াটা খুব সুন্দর, বিকেলে একবার পার্কটা তাই ঘুরে আসার কথা হঠাৎ মনে হল তাঁর। অভ্যাসবশতঃ অফিসের চপ্পলটা পরেই বেরিয়ে এলেন বাড়ী থেকে – মনে পড়ল সেই মারিয়মের কথা, কেমন আছে সে কে জানে!

যা সন্দেহ করেছিলেন – মারিয়মকে বেঞ্চে বসে অপেক্ষা করতে দেখা গেলনা। মনটা একটু কেমন ভারী হয়ে এলো, এই কদিনেই বেশ একটা সখ্যতা গড়ে উঠেছিল তাঁদের মধ্যে। আজ শরীরে যেন হাজার হাতির বল, দশ চক্কর কেটেও একটুও ক্লান্তি বোধ করলেন না তিনি। বেঞ্চে পা তুলে বসতেই হঠাৎ কানে এলো –
"এটা কেন? তোমার ঐ জুতোটা কোথায় গেল?"
চমকে পিছনে ঘুরতেই সন্ধের আবছা আলোয় মারিয়মকে খেয়াল করতে পারলেন নগেনবাবু। সেই ধূসর জামা – ঠোঁট ও গাল ভয়ঙ্কর ফ্যাকাসে, শুকনো।
"ও তুই, চমকে গেছিলুম আমি! তা তোর শরীরের একি অবস্থা হয়েছে রে, খেতে পাস না নাকি? তুই কোথায় থাকিস বলতো?" নগেনবাবুর প্রশ্নের উত্তরে মারিয়ম চিঁ চিঁ করেই প্রায় বলল -
"ঐ ওদিকে..."
ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন নগেনবাবু, মনে হয় ঐ কবরস্থানের ওপারে কোনও বস্তিতে থাকে। নরম গলায় বললেন–
"চ আজ তোর মায়ের সাথে কথা বলি – কিছু পয়সা কড়ি যদি লাগে....."
ক্ষীণ অথচ দৃঢ় কন্ঠে বলে ওঠে মারিয়ম - "তুমি আগে ঐ জুতোটা পরে এসো, আমি পরে হাঁটব। উফ, কতদিন যে মজা করিনি..."

নগেনবাবু যতবারই বলেন – আজ আর ভাল লাগছেনা, কাল হবেখন, মারিয়ম কিন্তু নাছোড়বান্দা। ওর চোখে কিছু একটা আছে, কিরকম বশ হয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

অগত্যা বাড়ী এসে আবার সেই জুতোজোড়া বার করলেন নগেনবাবু। স্ত্রী বারবার বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগলেন - অনেকদিন পর প্রথম পার্কে যাওয়া, বেশী পরিশ্রম করা উচিৎ নয়। বাধ্য হয়ে সোমলতা দেবীকে বুঝিয়ে বললেন সব কিছু – মারিয়মের জেদ ও জুতোর অদ্ভুত ব্যবহার, এবং কথায় কথায় বেরিয়ে এলো জুতোটি পায়ে দিয়ে মেয়েটির মানসিক ও শারীরিক পরিবর্তন। চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগলেন সোমলতা

দেবী, আর সেই ফাঁকে সরে পড়লেন নগেনবাবু। পার্ক থেকে ফিরে বাড়ীতে ঢুকতেই চমকে উঠলেন সোমলতা দেবী – এই মাত্র প্রায় ঝড়ের গতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল যে লোকটা, সে কিনা ফিরল প্রায় ধুঁকতে ধুঁকতে, চোখ উল্টে। নগেনবাবু বিছানায় ঢলে পড়তেই আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি, ধরাধরি করে তৎক্ষণাৎ তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে। গম্ভীর মুখে ডক্টর সমর বোস জানিয়ে দিলেন – রক্ত দিতে হবে এই মুহূর্তে, না হলে বাঁচানো মুশকিল। আচমকা এই ঝড়ে বেসামাল হয়ে পড়লেন সোমলতা দেবী।

****

হাসপাতাল থেকে বাড়ী ফিরতে ফিরতে রাত বারোটা। অমাবস্যা বলেই বোধহয় অন্ধকারটা একটু বেশী মনে হল সোমলতা দেবীর। ঢোকার সময় দরজার কাছেই জুতোটা লক্ষ্য করলেন তিনি। কুচকুচে কালো রঙ, হাতে নিয়ে যেন একটু বেশীই ভারী বলে মনে হয়। কিছুক্ষণ কি জানি ভাবলেন, তারপর রান্নাঘরে এসে বার করলেন বিশাল এক দা। বাতাস যেন ভারী হয়ে এলো, অন্ধকারে জুতো-দুটো ঠিক যেন একজোড়া জ্বলন্ত চোখ – প্রবল সন্দেহের চোখে দেখছে তাঁকে। ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি – একহাতে জুতোজোড়া, অন্যহাতে কালো নিকষ দা-খানা। একটানা হিস-হিস গর্জন ভেসে এলো কানে – হাতখানা যেন কাজ করছেনা, কেউ জোর করে আটকে রাখতে চাইছে। জোরে-জোরে ইষ্টনাম জপতে লাগলেন সোমলতা দেবী। আচমকাই জুতোর ওপর পড়ল দায়ের কোপ, একের পর এক – ফিনকি দিয়ে ছুটলো রক্ত। হাঁপাতে লাগলেন তিনি, কিন্তু থামলেন না – ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে রইল জুতোজোড়া এক কোনে। কোথায় যেন শোনা গেল চাপা কান্নার আওয়াজ, গুমরে গুমরে উঠছে।

প্রায় হপ্তা-খানেক পরে বাড়ী ফিরলেন নগেনবাবু – এই ধকল কাটিয়ে তিনি যে আবার বেঁচে ফিরবেন কেউ আশাই করেনি। আরও কিছুদিন পর থলে হাতে বেরলেন বাজারে – মোড়ের মাথায় নজর পড়ল জন ডিসুজার দোকানটা, থরে থরে সাজানো রয়েছে নানাধরনের জুতো। পাশ কাটিয়ে চলেই যাচ্ছিলেন, হঠাৎ পিছন থেকে ভেসে এলো জনের হাহাকার –
"মেয়েটাকে আমার....মেরেই ফেললেন....স্যার....."

****সমাপ্ত****

প্রবাসী বাঙালী দেবতোষ ভট্টাচার্য কর্মসূত্রে আজ বহু বছর ব্যাঙ্গালোরের বাসিন্দ, অবসর সময়ে অল্পবিস্তর লেখালেখির বদভ্যাস আছে, আর লেখার মাধ্যমে যদি একবার বই পড়ার নেশাটি কাউকে ধরিয়ে দেওয়া যায় তবে সেটাই হবে তাঁর মস্ত পাওয়া। গল্প, কবিতা বিভিন্ন ওয়েব ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে।

স্মৃতির পূজো - পূজোর স্মৃতি –

ঝর্না বিশ্বাস

এখনও পূজো ভাবলেই শুধু কলকাতাকে মনে পড়ে আর কলকাতা ভাবলেই সেখানে কাটানো পূজোর দিনগুলো!

পূজোয় কলকাতা যেন অন্য কেউ। এই সময় তাঁর নতুন সাজ সবাইকে আকর্ষণ করে কাছে টেনে নেয়। প্রবাসের বাঙালিরা বাক্সপেট্রা নিয়ে ঘরে ফেরে। বাপের বাড়িতে এ কটা দিন আনন্দে কাটাবে ভেবে সদ্য বিবাহিত মেয়েটিও আসে তাঁর মায়ের কাছে। বাজারঘাট শুরু হয় প্রায় এক মাস আগে থেকেই। 'সেল' শুরু হয়ে যায় এখানে সেখানে। শাড়ির দোকানগুলো সব মনলোভী রঙের মাস্টারপিস ঝুলিয়ে রাখে বাইরেতে, যা দেখলেই মেয়ে মানুষের চোখ জুড়িয়ে যায়।

এখনও ছেলেবেলার পূজোর স্মৃতি মনকে নাড়া দিয়ে যায়। তখন কলকাতা ছিল অন্য রকম। খুব সাদামাটা ভাব ছিল তার, আর তাতেই অনেক স্পেশাল ছিল সে। পূজোতে হিসেবে গুণে গুণে প্রায় চার খানা জামা হয়েই যেত। খুব আনন্দ করতাম পূজোর ওই ক দিন। যদিও পূজোর বাজার করা নিয়ে কোনদিনই হট্টগোল করিনি। মা যা কিছু কিনে নিয়ে আসতেন তাই পছন্দ হয়ে যেত। সেই সময় প্রতিটা দিনের জন্য আলাদা জামা হওয়া ছিল বিশাল ব্যাপার। যেহেতু মা ও বাবা দুজনেই চাকরি করতেন তাই এ ব্যাপারে তাঁরা কখনই কোনও কার্পণ্য করেননি।

বন্ধু বলতে বিশাল কোনও গ্রুপ কখনই ছিল না। স্কুলে পূজোর ছুটির ঠিক আগের ক'টা দিন শুভেচ্ছা বিনিময় হত, থাকত কিছু ছোটখাটো উপহারও। তখন উপহারে দামের চাইতে ওই অল্প দেওয়া-নেওয়া টুকুই যেন ছিল বিশাল প্রাপ্তি।

পূজো ভাবতেই মনে পড়ে, সেই ভোর ভোর উঠে রেডিওতে মহালয়া শোনার কথা। বাইরে তখনও বেশ অন্ধকার থাকত। বাবা ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখতেন। যদিও তা বাজার অনেক আগেই তিনি উঠে পড়তেন। তারপর একে একে আমরা সবাই। ভাই তখন খুব ছোট, তাই অতটা না বুঝলেও ও সেই দলেতে যোগ দিত। উঠেই শুনতে পেতাম, পাশে কাকুদের বাড়ি থেকেও ভেসে আসছে আগমনীর সুর। শ্রী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সেই কন্ঠস্বর এখনও কানে গমগম করে। অদ্ভুত সেই উচ্চারণ! সংস্কৃতের এক একটি শব্দ এত স্পষ্ট যা শুনতে শুনতে কখন যে সময় চলে যেত টেরই পেতাম না।

সেদিন থেকেই চারদিকে যেন পূজো পূজো ভাব শুরু হয়ে যেত। যদিও এখন আর সেই আগের মত রেডিওতে মহালয়া শুনতে পাই না, তবে অভ্যাসটা ছাড়তে পারিনি। এখনও সকালে উঠে বিভিন্ন বাংলা চ্যানেল গুলোতে মহালয়া-র অনুষ্ঠান দেখি। তবে সেদিনের চণ্ডীপাঠ শোনাটা যে রীতিমত মিস করি তা টের পাই বুকের মধ্যিখানে।

পূজো মানেই চারদিকে শিউলি ফুলের মঁ ম গন্ধ। এটাই আভাস দিত, মা দুর্গা আসছেন।

পূজো শুরু হওয়ার বেশ কিছু আগে থেকেই শিউলি ফোঁটা শুরু হত। আমাদের বাড়িতেও একটা বড় গাছ ছিল শিউলি ফুলের। ছোট সাদা ওই ফুলের ভারে গাছটাকে যে কি সুন্দর লাগত তা বলে বোঝানো যাবে না। সকালে গাছতলাতেও ছড়িয়ে থাকত গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল। ঘরে পূজোর জন্য তা তুলে আনলেও সেখানে কিছু কম পড়ত না।

এদিকে স্কুলে পূজোর ছুটির জন্য বছরের শুরু থেকেই আমাদের অপেক্ষা চলত। প্রতি বছর স্কুল বন্ধ থাকত ষষ্ঠী থেকে লক্ষ্মীপূজোর পর দিন অবধি। পঞ্চমীতে পাড়ায় ঠাকুর আনা হত। সেই দিনটার গুরুত্বও কিছুমাত্র কম ছিলনা। পাড়ার ছেলেরা ও ক্লাবের বড়রা মিলে ভ্যানে করে ঠাকুর নিয়ে আসত। আর আমাদের মন আনচান করত সেই সন্ধ্যায় একবার যদি মায়ের অনুমতি পাওয়া যায় তাহলে ক্লাবের মাঠে করা পূজোর প্যান্ডেলে যাওয়া যেতে পারে। যদিও সেদিন ঠাকুরের মুখ ঢাকা থাকত। তাও সেখানে একবার ঢুঁ মারাটাই আমাদের কাছে বিরাট কিছু ছিল।

ষষ্ঠী থেকে পূজোর শুরু হত। তাই সকাল থেকেই ঢাকের আওয়াজ, আর চারদিকে যেন খুশির আবেশ ছড়িয়ে পড়ছে তাতে। আমাদের বাড়িটা প্যান্ডেলের খুব কাছে হওয়াতে স্পষ্ট ছিল তা আরো। তার ওপর মাইক তো ছিলই। শুরুতে আলোকসজ্জাও করা হত অল্পস্বল্প। তবে পরের দিকে পুরো পাড়াটাই রঙিন আলো দিয়ে সাজানো হত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হওয়ার খুব একটা চল তখন ছিল না। তবে একবার বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র স্বয়ং এসেছিলেন আমাদের পাড়ায়, তাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল পূজোর শুরুর দিনে। মনে আছে সেদিন পাড়ার মেয়েদের ভিড়ে আমিও মায়ের একটা লাল পার সাদা শাড়ি পরে শঙ্খ বাজিয়েছিলাম। সেই মুহূর্তটা আমার কাছে বিশেষ ভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে, কারণ যে মানুষটির শুধু কণ্ঠ শুনেই এতদিন মুগ্ধ ছিলাম, সেদিন তাঁকে সামনে থেকে দেখার আনন্দই ছিল আলাদা।

এদিকে মণ্ডপে বসে পূজো দেখার জন্য লাইন দিয়ে চেয়ার পাতা থাকত। আর সেই চেয়ার ধরা নিয়েও আমাদের মধ্যে তুমুল হিসেব নিকেশ চলত! কেউ একটু আগে প্যান্ডেলে যাবে শুনলে তাকেই চেয়ার ধরার দায়িত্ব দেওয়া হত।

দুপুরের দিকটায় এবং বিকেলেও মাইকে বাজানো হত বাংলা ছায়াছবির হিট গান। হিন্দি গানের প্রতি উশখুসানিটা তখনও অত বেশি আসেনি। তবুও বাপি লাহিড়ী ও কিশোর কুমার প্রায়ই পাড়া কাঁপাতেন। আর কাঁপাত “আশিকী” মুভির গানগুলোতে সদ্য আসা কুমার সানু। রাহুল রায়ের মতো রোগা টিংটিঙে ছেলেটাকেও ওই গানে গানেই তখন ভালোবেসে ফেলেছিলাম। ছবিতে প্রেম আর তাও আবার অমন হিরোতে দেখে সে সময় অনেক কথাই শুনতে হত।

সপ্তমীও কাটত আমাদের বেশ হৈ হুল্লোড় করে। পাশের পাড়ায় আরও একটি বড় পূজো হত, আর পূজো হত পাড়ার একটি বাড়িতেও। পারিবারিক সেই পূজোর ব্যাপারই ছিল আলাদা। কত লোকজন সব সময় ওদের বারান্দা ঘিরে বসে থাকত। বয়স্করা ঠাকুরের কাছে বসে গল্প জুড়ে দিতেন। ও বাড়িতে যদিও আমাদের চেনাশোনা কেউ ছিল না, তাও রাস্তার পাশে আসা যাওয়ার পথে একবার করে চোখে পড়েই যেত ওদের প্রতিমার সাজ সজ্জায়।

বিকেলের দিকটায় আমরা বন্ধুরা সেজেগুজে বেরোতাম। তখন সাজগোজ মানে শুধু ট্যালকম পাউডারে গাল সাদা করা আর চোখে একটু কাজল ও কপালে ছোট টিপ, জামার রঙ মিলিয়ে। হাত ও পায়ে নেইল পেইন্টেরও তখন খুব শখ ছিল। তবে ক্লাস এইট বা নাইনে এসে একটা ইম্প্রেসিভ লুক দিতে সবার মত আমারও খেয়াল থাকত। তখন শ্যাম্পু ওড়ানো চুল, ম্যাচিং কানের দুল ও পায়ে একখানা হিলজুতো হলে তো সোনায় সোহাগা...

এদিকে পূজোতে অষ্টমীর গুরুত্ব এখনকার মত আগেও ছিল তুমুল। শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত বলতে ছিল, অষ্টমীর অঞ্জলি...সেদিন সবচেয়ে ভালো জামাটা পরব বলে আলাদা করে রেখে দিতাম। তারপর সকাল সকাল স্নান সেরে নতুন জামাকাপড় পরে সোজা হাঁটা দিতাম প্যান্ডেলে। ততক্ষণে মাইকে অ্যানাউন্সমেন্ট শুরু হয়ে গেছে, অঞ্জলি হবে আরেকটু পর...শুনে টিপটিপ করত যেন ভেতরটা, সাজগোজে সেদিন একটু দেরী করেই ফেলতাম। তাও পাশের ঘর থেকে মায়ের অনবরত তাড়ায় অতঃপর বেরোতেই হত।

মা ফল মিষ্টি দিয়ে একটা থালা সাজিয়ে দিতেন সেদিনের পূজোয় দেওয়ার জন্য। মিষ্টির প্যাকেটের ওপর লেখা হত নাম ও গোত্র। এই কাজটা বেশিরভাগ সময় আমিই করতাম। তারপর মণ্ডপে প্রতিমার কাছাকাছি কাজে ব্যস্ত চেনা কেউ পেলে তাঁর হাতে দিয়ে কোনও রকমে ঠেলেঠুলে এক কোণে একটু জায়গা করে নিয়ে অঞ্জলি সারতাম। ও তার ফাঁকে ফাঁকেই একবার চারপাশ ঘুরে দেখে নিতাম মানুষজন। বয়সটাই ছিল এমনই যে তখন শুধু চোখে চোখে কথা হত, মুখ খুললেই ভয়। তাই পূজোর দিনে প্রিয় কারো এক ঝলক দেখা পাওয়াটাতেই থাকত সেদিনের অনেক বড় প্রাপ্তি।

সকাল থেকে উপোষের পর অঞ্জলি দিয়ে বাড়ি ফিরে লুচি তরকারি খাওয়ার চলন ছিল। মা প্রতিবার এই মেনুই করতেন। তারপর অষ্টমীর বিকেলে কাছাকাছি ঠাকুর দেখা চলত, সঙ্গে এন্তার খাওয়া দাওয়া। রাতের দিকে বাবা দূরের ঠাকুর দেখতে নিয়ে যেতেন। তখন রাতের রাস্তাগুলোকে এত জমজমাট লাগত যে ঘড়িতে ঠিক কটা বাজে খেয়াল করতাম না। তখন প্যান্ডেলের কারুকাজ, থিম এসবের বালাই না থাকলেও ছিমছাম প্যান্ডেলে বিরাজমান মা দুর্গার স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবিটি একেবারে যেন চোখে লেপ্টে যেত... আর তা থাকত টানা বেশ কয়েক দিন... জাঁকানো সাজ নয় মোটেও, তাও প্যান্ডেলের কোণায় কোণায় ধূপের গন্ধ, অনবরত বাংলায় কুটকাচালি যা আজ খুব খুব মিস হয়...প্রবাসে এসে তা আরো বেশি করে বুঝতে পারি যে কলকাতা থেকে আমি কত দূরে, কত আলাদা হয়ে গেছি।

ঠাকুর দেখার শেষে নানারকম স্টলে ভিড় করতাম - এগ রোল, চাউমিন, ফুচকা, চুরমুর – কোনও কিছু খাওয়াতেই তখন না ছিল না।

এদিকে নবমীতেও অঞ্জলি হত, প্যান্ডেলে ভিড় হত প্রচুর। আমরা বেশিরভাগ সময়ই চেয়ার নিয়ে গোল করে ঘিরে বসে থাকতাম। প্রচুর গল্প, পিএনপিসি – কে কেমন জামা পরল, কার শাড়িটা আজ বেশি সুন্দর, কাকে খুব বাজে লাগছে, কাকে মনে হচ্ছে এদিকে তাকাল - এই সব। আবার দুপুর হলেই যে যার বাড়ি ফিরে যেতাম, প্যান্ডেলও ওই সময়টায় একদম ফাঁকা। পূজোর প্রসাদ হিসেবে তখন বাড়িতে বাড়িতে ক্লাবের ছেলেরা একটা ভ্যানে বড় গামলায় খিচুড়ি ও লাবড়া নিয়ে আসত। আর বেল বাজতেই পাত্র নিয়ে যেতে হত। তবে এখন জেনেছি পাড়ায় নবমীতে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়। কুপন সিস্টেমে।

সেইদিন সন্ধ্যায় থাকত ছোট ও বড় গ্রুপের আরতি ও ধুনুচি নাচ প্রতিযোগিতা। তখন এই প্রতিযোগিতার আকর্ষণও কিছু কম ছিল না...সব বয়সের মধ্যে প্রতিযোগিতা হত...তবে অংশ নিতে আমি কখনই এগোয়নি...

বড়দের তালিকায় প্রতিবারই বাবার নাম থাকত এবং বাবা প্রাইজও জিতে নিতেন। পাড়ার বৌদি ও কাকিমারাও ধুনুচি নাচে অংশ গ্রহণ করতেন। আমরা সেখানে দর্শক, তুমুল আনন্দ করতাম ও জল্পনাও কে ফার্স্ট - কে সেকেন্ড হতে পারে এই নিয়ে। অনেকটা রাত হলে বাড়ি ফিরতাম ও সাথে থাকত আশ্চর্য এক মনখারাপ, পূজো তো কালই শেষ হয়ে যাবে।

পর দিন দশমী, সকলেরই মুখ ভার। একটা বছরের অপেক্ষা কিছু কম কথা নয়। তাই সারাদিন আর প্যান্ডেলে যেতাম না। একটা গুমোট ভাব থাকত ঘরে আর বাইরেও। বিকেল চারটে থেকে লাইন পড়ে যেত ঠাকুর বরণের আর আমরা মায়ের সঙ্গে সেখানে ভিড় করতাম বই ছোঁয়াব বলে। চারপাশে তখন সিঁদুর খেলা চলছে, সাথে মিষ্টিমুখও। তবে স্পষ্ট হত ঠাকুরের জল ছলছল চোখ! এই একটা মুহূর্ত এখনও আমার খুব মনখারাপ হয়।

সন্ধ্যে হলে ঠাকুর নামানো হত। এতদিন আনন্দ করে যে মা-কে পূজো করলাম আজ তাঁর বিসর্জন। জীবনের ধারাবাহিকতা মেনে নিয়ে তাঁকেও আজ চলে যেতে হবে। ঢাক বাজানো শুরু হত জোরে...আরও জোরে...

পাড়ার ছেলেমেয়েরা নাচতে নাচতে এগিয়ে যেত পাড়ারই কাছাকাছি এক পুকুরের দিকে। আমরা সেই দলে ভিড় করতাম, আর গুটি পায়ে এগিয়ে যেতাম সিঁদুরে লাল ও মুখে গোঁজা মিষ্টি মুখের সেই মা দুর্গার সাথে। তারপর একটা সময় জলে আস্তে আস্তে মিশে যেত ঠাকুরের মুখ ও তাঁর সম্পূর্ণ অবয়ব। যদিও প্রতিশ্রুতিতে থাকত, " ভালো থেক সকলে, আসছে বছর আবার আসব"।

ছেলেবেলার পূজোয় কাটানো আরো এক মনে রাখার মতন দিন হত "বিজয়া সম্মিলনী"... কে কে আসছে এই নিয়ে জল্পনার যখন অবসান হত, তখন কে আগে গিয়ে চেয়ার ধরবে তার তোড়জোড় শুরু করে দিতাম। পড়া না হলে মায়ের অনুমতি পাব না জানতাম, তাই ভালো মেয়ের মত পড়াটি সারলেই মা বেরোনোর আজ্ঞা দিতেন। তখন আর আমাদেরও দেখে কে...ইয়া ছুট পাশের ক্লাবের মাঠে...আর কোনও দিন যদি অ্যানাউন্সমেন্টের আওয়াজ শুনতে পারছি, অথচ বেরোতে পারিনি তখন নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে দুঃখী মানুষটি মনে হত।

আমাদের পাড়ায় এক কাকিমা ছিলেন, অবিকল সন্ধ্যা মুখার্জি যেন...তাঁর গলা এত অত্যাশ্চর্য ছিল যে হেভি হেভি তারকারা আসার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা তারই গানে বিভোর হয়ে থাকতাম। তারপর নচিকেতা, জোজোর মত বড় শিল্পীরা আমাদের পাড়ায় এলে কলকাতার বিখ্যাত মশার কামড় খেতে খেতে কখন যে ভোর হয়ে যেত টেরই পেতাম না...

যথারীতি পরদিন ঘুমে ঢুলছি... কিন্তু বাড়ি বাড়ি ঘুগনি, লুচি তরকারির ট্রীটখানি তো আর মিস করা যায়না! সেদিন সন্ধ্যার এ বিশাল পেটপূজো সেরে যখন ফিরতাম, একটা খারাপলাগা ঘিরে ধরত...কারণ কাল থেকে আর কোনও বেরোনো নেই...কারো সাথে সাক্ষাৎ নেই...শুধু বই আর আমি – আমি আর বই... কাহাতক ভালো লাগে! এক একটা বছর এমনই হু হু করে চলে যেত। এখন ক্যালেন্ডারের কেবল পাতা উলটে যাই, কিন্তু অপেক্ষাটা আর আগের মত নেই।

প্রবাসে আছি, এখানেও দূর্গাপূজো হয়। তাতে অংশ নিই, অঞ্জলি দিই – আর দুপুরে ও রাতের খাওয়া দাওয়া বাইরেই সারি। তারপর রাতের জলসায় বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা কলাকুশলীদের অনুষ্ঠান দেখতে গিয়ে হাততালিও দিই প্রচুর। তবু মনে হয় কলকাতা ছাড়ার সাথে পূজোর কিছু একটা হারিয়ে ফেলেছি যা আর কোনদিনও ফিরে পাব না।

ঝর্না বিশ্বাস:

জন্ম ও পড়াশোনা কলকাতায়। গণিতে স্নাতকোত্তর। পেশা শিক্ষকতা। বর্তমানে মুম্বাই প্রবাসী। গল্প ও কবিতা পড়তে ভালোবাসি আর সেই সূত্রে লেখালেখিও করি কিছু বাংলা পত্রিকায়।

একটু ভেবে দেখুন

পরেশ নাথ রায়

খণ্ড ১

ডিসেম্বর ২০১৯। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিমণ্ডলে একটি বিশেষ সময়। সময়ের উজানে এক বিশেষ মুহূর্ত।

‘ভোর হল দোর খোল

খোকা-খুকু ওঠো রে’

ভোর হল; দোরও খুলল; খোকা - খুকুরাও ঘুম থেকে উঠল। ঘরে ঢুকল আলো। রবিমামাও তার সন্তানদের প্রতি কিরণ দিতে শুরু করলেন। কিন্তু যাকে তিনি সব থেকে বেশি স্নেহ করেন, তার প্রতি আজ এরূপ বিরূপ কেন? তার ‘পৃথিবী’ নামক গ্রহটিকে আজ এত মলিন দেখাচ্ছে কেন? তবে কি কোন এক অপদেবতা কোন এক ভিন গ্রহ থেকে এসে ঘরে ঢুকে পড়েছে? এত সকাল সকাল এ কি ধরণের অনাসৃষ্টি!

শুরু হ’ল শ্লোক পাঠ, কেউ বা করলেন মন্ত্র উচ্চারণ। কোথাও কোথাও পূজা - অর্চনা। পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত; উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম, সকলেরই মুখে শুধু একটাই কথা- “কি হ’ল! এ কি হ’ল!”

ওঁ জপকুসুম সংকাশ কাশ্যপেয় মহাদ্যুতিং।

ধ্যান্তরিং সর্ব পাপঘ্নম প্রণতোহস্মি দিবাকরম।।

পৃথিবীর হাল কিন্তু যে কে সেই। মলিনতার কোন উন্নতি তো নেইই, বরং অবনতির দিকেই। তাই কোথাও কোথাও গুরুজনদের পরামর্শে ঘরে ঘরে বাজনা বাজানো শুরু হল। শুরু হল শঙ্খধ্বনি। কাঁসর-ঘন্টা থেকে শুরু করে যার কাছে যা ছিল তাই দিয়ে বিভ্রান্তিকর শব্দ ও আওয়াজ যেন তোলপাড় করলো সারা দেশ। একটা অদৃশ্য শক্তি একটু একটু করে প্রতি ঘরে ঘরে, ঘরে ঘরে থেকে দেশে দেশে, দেশে দেশে থেকে প্রায় পুরো পৃথিবীটাকে অত্যন্ত দ্রুত আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে কব্জা করে ফেলল। ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে যারা বর্তমান নেই, তারা বোধ করি কখনো কল্পনাও করতে পারবে না।

হ্যাঁ, ঢুকে পড়লো ‘করোনা’ - ‘কোভিড-১৯’। এটা ‘মহামারী’ নয়, ‘অতিমারী’। কিভাবে ঢুকলো, কখন ঢুকলো, দেখতে কেমন ইত্যাদি নানান জিজ্ঞাস্য সকলের মুখে মুখে ঘুরতে লাগল। কৌতূহলের সীমানার বাইরে গিয়ে কেউ কেউ বলেই বসলেন, আমাদের এই বিজ্ঞানের যুগে কীভাবে সকলের সামনে দিয়ে এভাবে কেউ ঢুকতে পারে! না, এটা আর কিছু নয়, এটা একটা ‘ভাইরাস’ - খালি চোখে দেখা যায়না - তাই আমাদের সকলের নজর এড়িয়ে ঢুকে গেল। আর আমরা যারা এখনও যুঝে রয়েছি তারা একটি বিরল ঘটনা অনুধাবন করতে শুরু করলাম। একান্ত বাধ্য হয়েই গত মার্চ মাস থেকে এটা ‘অতিমারী’ হিসাবে গণ্য হল।

ইতিহাসে ‘মহামারী’ কি সেটা অনেক অনেক বার পড়েছি, শুনেছি, জেনেছি, বুঝেছি। কিন্তু এটার গতি, প্রকৃতি এবং বেগ এত প্রকট ও প্রবল যে খুব কম সময়ের মধ্যে দিকে দিকে সে নিজেকে ছড়িয়ে দিল। এর করাল ছায়ার হাত থেকে আমাদের সকলকে অতি শীঘ্র উদ্ধার পেতে হবে। ঠিক, কিন্তু কি ভাবে? এরা তো সংখ্যায় অপরিসীম। এরা হয়তো আমার চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে - হয়তো রয়েছে আমার ডানদিকে, বাঁ

দিকে, সামনে, পিছনে, মাথার উপরে - সর্বত্র। সবথেকে বড় লুকোচুরি খেলা এই - এরা আমার অস্তিত্ব বুঝতে পারছে, আমি কিন্তু ওদের অবস্থান ধরতে পারছি না। কেবলই শুধু কানামাছির মত হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছি। ওরা কিন্তু সঠিক জানে আমার নাকের ফুটোটা কোথায়। কিভাবে ঐখান দিয়ে ঢুকে শরীরের ভিতরের ফুসফুস দুটোকে খতম করে ধীরে ধীরে আমার গোটা শরীরের সবকিছু কে বিকল করে, কি করে আমাকে সংহার করা যায় - সমস্ত জানে! কিন্তু, কি ওদের উদ্দেশ্য, কেন ওরা আমাদের নিয়ে এই মারণ খেলায় লিপ্ত? আমারই চারিদিকে অচেনা অজানা ভয়ার্ত অন্ধকার! অপ্রতিরোধ্য ওদেরকে না পারছি মারতে, না পারছি ধরতে, না পারছি সাহায্যের জন্য থানা বা দমকলে খবর দিতে। রাগে, ভয়ে, ঘৃণায় সংকুচিত হতে হতে আমাদের মধ্যে এখন এটা একটা আতঙ্কের রূপ নিয়েছে।

কেননা অতিরিক্ত সাহস দেখিয়ে লাভ নেই। উল্টো ফল হতে পারে। বাস্তবিক ক্ষেত্রে এখন এটা বেশ পরিষ্কার যে প্রয়োজনে অথবা অপ্রয়োজনে অতিরিক্ত সাহস দেখিয়ে যারা অনেক কিছু অবজ্ঞা করেছেন তাদের অনেকেই আজ আর নেই।

ঠিক যেমন আমরা নীল-লাল মাছগুলোকে ছোট একটা কাঁচের বাক্সে আবদ্ধ করে জিইয়ে রেখে তাদের চলাফেরা, চালচলন, গতিবিধি উপভোগ করি, সেইরকমই এরাও যেন চিড়িয়াখানায় জীবজন্তুদের মত আমাদের সকলকে স্ব স্ব আবাসস্থলে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য করে ফেলল। অতএব, আতঙ্কের জায়গাটাকে অধিক সংক্রমিত হওয়ার হাত থেকে কিছুটা রেহাই! এর ফলস্বরূপ তৈরি হল সামাজিক-শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা, মুখোশ পরা, স্যানিটাইজার ও সাবান ব্যাবহারের প্রাবল্য। এর পরোক্ষ ফল হল সামাজিকতা, আত্মীয়তা, বন্ধুবান্ধব সকল ক্ষেত্রে দূরত্ব বেড়ে যাওয়া। বন্ধ হ'ল আড্ডা, বিভিন্ন ধরণের সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি, খেলাধুলা এবং আরো কত কি। সবই আপাতত প্রায় বন্ধ। গৃহবন্দী হয়ে সময় কাটানোর জন্য গুরুত্ব বাড়ল তাস, দাবা, লুডো, ক্যারাম জাতীয় খেলার ।

এসবের প্রভাব পড়ল সারা দেশে, এবং দেশ থেকে সারা পৃথিবীর সমস্ত কোণায় কোণায়। পৃথিবীর ইতিহাসে এইরকম বড় অঘটন বোধ করি খুব কমই ঘটেছে। অধিকাংশ দেশের অর্থনীতি ক্রমশ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে। বেহাল অবস্থায় মানুষের জীবনযাত্রা ওষ্ঠাগত প্রায়। সমগ্র মানবজাতি আজ এই দুর্বিষহ, দুর্দমনীয় এক করুণ সঙ্কটের শিকার। প্রতিদিনই শ'য়ে-শ'য়ে, হাজারে-হাজারে মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন। সময়ের গতি যত সামনের দিকে এগোচ্ছে, দূরের দিকে তাকালে মনে হচ্ছে রেলের ট্র্যাকের লাইন দুটো এক হয়ে মিশে যাচ্ছে। যতই এগোচ্ছি ততই দেখছি সেই মিশে যাওয়ার বিন্দুটাও ক্রমশ: আরো আরোও এগিয়ে যাচ্ছে। এর তবে শেষ কোথায়?

এরই মধ্যে শুরু হল একে অপরকে দোষারোপ করা। এবং এটা ব্যক্তিবিশেষে, ধর্মবিশেষে, অথবা দেশবিশেষে ক্রমাগত চলতেই থাকল। দুর্ভাগ্য আমাদের! যে সময়ে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের, প্রতিটি দেশের সঙ্গে অন্যান্য দেশের জন্য সমবেদনা, সহানুভূতি এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার কথা, সেখানে আমরা বিপরীত আচরণেই লিপ্ত। আমরা কি তবে এতটাই স্বার্থপর, অমানবিক হয়ে উঠছি? অবাক পৃথিবী! অবাক আমাদের অনুভূতি, ভালবাসা, স্নেহ, মায়া-মমতা, সহানুভূতি!

বেশ মনে আছে - আমার তখন কৈশোরকাল। ঠাকুমা মৃত্যুশয্যায়, আমি শিয়রে বসে। উদ্দেশ্য- তাঁকে আমি ছাড়বো না। আমাকে ডিঙিয়ে তিনি যদি যেতে পারেন, তো যাক! কিন্তু নাহ: মৃত্যু কাউকেও ডরায় না। আমি ছাড়া আশেপাশের যারা ছিল সকলেই বেদনাবিভোর। ঠাকুমা কিন্ত কি সুন্দর ড্যাং ড্যাং করতে করতে চলে গেলেন। অদৃশ্যভাবে, সকলের সামনে দিয়ে! কি সুন্দর দেখাচ্ছিল অবয়বটি। মনেই হচ্ছিল না যে তিনি আর নেই। ঘটনা একটা ঘটল, আমি উপলব্ধি করলাম- 'মৃত্যুমুহূর্ত্য'টিকে যে বা যারা প্রত্যক্ষ করে, মৃত্যু যে কতটা বেদনাদায়ক, অর্থাৎ 'মৃত্যুযন্ত্রণা' যে কি, যেন শুধু তারাই অনুভব করে - যিনি চলে গেলেন তিনি

বুঝি নন। এসব কথা বলতে গেলে কোন অসুবিধে হয় না। কিন্তু লিখতে গেলে চোখে জল এসে যায়। বোধকরি লিখতে খানিক সময় লাগে, তাই !

তা যা হোক!

মানুষে মানুষে ভেদাভেদের একটা নতুন অবস্থান তৈরি হ'ল। যে অসুস্থ হল সে হয় এটাকে গোপন করছে, নতুবা সাধারণের কাছে হয়ে উঠছে অচ্ছুৎ। লক ডাউনের ফলে বন্ধ রাস্তা ঘাট। শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য সামনাসামনি কেউ আসছে না। এই অবস্থায় অদৃষ্টের দোহাই না দিয়ে আর কি কোন উপায় বাকি থাকে?

খণ্ড ২

সারা পৃথিবী তথা আমাদের ধরিত্রী মাতার আজ এক করুণ অবস্থা। মারামারি, হানাহানি, দাঙ্গা এসব তো লেগেই আছে। অন্যদিকে অতিবৃষ্টি ,অনাবৃষ্টি, বন্যা, সুনামি, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, অগ্নুৎপাত, দাবানল, সামুদ্রিক ঝড়, তুষারপাত, বিশ্ব-উষ্ণায়ণ, নিয়ে তার টালমাটাল পরিস্থিতি। নানারকম সমস্যায় সে একেই অনেকাংশে জর্জরিত, তদুপরি আবার এসব কি?

তবে, ধরণীর আজ এইরকম বিরূপ দশার জন্য আমরাও কম দায়ী নই। ভূপৃষ্ঠের উপর যেখানে সেখানে বড় বড় গর্ত খনন করা, ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় -পর্বত ধ্বংস করা, প্রাকৃতিক সম্পদকে নির্মমভাবে ধ্বংস করা, পারমাণবিক বোমা ও অস্ত্রের সাহায্যে সভ্যতার বিমূর্তিকরণ ইত্যাদি আজও কি আমাদের শোভা পায়? যত্রতত্র প্লাস্টিকের অপব্যবহার আমরা তো এখনও করেই চলেছি। সভ্যতার বিকাশের পথে এসমস্ত সীমাহীন কর্মকান্ডের কুফল হিসেবে মানুষ আজ অসংখ্য দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে জর্জরিত। এর ওপরেও যাকে বলে, ‘কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের’ মতো - প্রবল বেগে ধেয়ে আসছে অতিমারী - ‘করোনা’।

এত সব ধ্বংসের হাত থেকে কবে আমরা উদ্ধার পাব? বোধহয় সেইদিনই উদ্ধার পাব, যেদিন পৃথিবীটাকে আমরা একান্ত আপন করে ভাবতে পারব, অনুভব করতে পারব যে এটা আমার পৃথিবী, আমার ভালবাসা। ততদিন পর্যন্ত কি আমরা পারব অপেক্ষা করতে? কে বলে দেবে? হ্যাঁ, একমাত্র ভবিষ্যৎ-ই পারবে বলে দিতে।

এবার একটু অন্যভাবে ভেবে দেখলে কেমন হয়? ‘পৃথিবী’ নামক একটা মহা ভরাট গোলক মহাশূন্যে ভেলার মত ভেসে থেকেও ভার বহন করছে এক বিশাল অনন্ত জলরাশি, অপরিসীম স্থলভাগ, পাহাড় -পর্বত মালা, দুর্গম অরণ্যাঞ্চল, তুষারাবৃত মেরুঅঞ্চল, অগণিত অসংখ্য উদ্ভিদ, জীবজন্তু, এবং তারসঙ্গে এক বিশাল বায়ুমণ্ডলের। এরই সঙ্গে বিরামবিহীনভাবে নিজস্ব কেন্দ্রের চারদিকে বন্ বন্ করে ঘুরে চলা ও একই সঙ্গে সূর্যের চারিদিকেও এক নাগাড়ে একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথে ক্রমাগত ঘুরে চলা। পৃথিবীর এইরকম একটি বিশাল কর্মকান্ড প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে ঘন্টা - মিনিট - সেকেন্ড - প্রতিটা মুহূর্তকে অক্ষুণ্ণ রেখে, মর্যাদা দিয়ে অবিরাম গতিতে ঘুরে যাচ্ছে। তার কোন ক্লান্তি নেই, হয়তো অনবরত ঘাম ঝরছে, তবুও কারো কাছে কোন অনুযোগ করেনা। ঠিক ঠিক সময়ে হচ্ছে ঋতু পরিবর্তন। অতিক্রান্ত হচ্ছে বছরের পর বছর। ভাবতে আশ্চর্য লাগে মানব সভ্যতা এইরূপ একটি ভূমির উপর প্রতিপালিত হয়েও কিন্তু ধরিত্রী মাতার মতন এতটা একনিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও সহিষ্ণু হয়ে উঠতে পারেনি।

এরূপ আরো কয়েকটা গ্রহ ও উপগ্রহ মিলে সূর্য পরিবার। এই পরিবারের মধ্যে ‘পৃথিবী’ ছাড়া বাকী আর যে সমস্ত গ্রহরা রয়েছে, তারাও প্রত্যেকেই যে যার নিজ নিজ কেন্দ্রে ঘুরছে এবং একই সঙ্গে সূর্যের চারিদিকেও একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরছে। নিজস্ব কক্ষপথে সূর্যকে আবর্তন করার ফলে কারো সঙ্গে কারো কোন সংঘর্ষ হবার কোন উপায় নেই। এই সব গ্রহদের মধ্যে কারও কারোর এক বা একাধিক উপগ্রহও থাকতে পারে এবং

তাদেরও আবর্তনের গতি প্রকৃতিও গ্রহদেরই মতন। অবশ্যই সূর্যও তার পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে মহাশূন্যের মধ্যে নিজস্ব কক্ষপথে ঘুরে বেড়ায়। তাতে অসুবিধে কোথায়? সবই তো মহাশূন্য! বেশ,তাই যদি হয়, এই বিশাল মহাশূন্যের মধ্যে আমরা আজকে ঠিক এই মুহূর্তে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঠিক যে জায়গায় ভেসে রয়েছি, তার ঠিক পরের মুহূর্তেই কিন্তু তার অবস্থানটার পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। তাই নয় কি? ভাবতে বেশ লাগে, প্রতিমুহূর্তেই আমরা পৃথিবীপৃষ্ঠের উপর দাঁড়িয়ে মহাশূন্যের মধ্যে কোনো না কোনো একটা স্থানে ঠিক যেন ভেলার মত করে ভেসে রয়েছি। এ তো গেলো সূর্য পরিবারের কথা। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে সূর্য হ'ল বিশ্বব্রহ্মান্ডের একটি 'নক্ষত্র'মাত্র। এইরকম হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র এই মহাশূন্য বিশ্বব্রহ্মান্ডের মধ্যে রয়েছে। এবং তাদের প্রত্যেকের পরিবারের গঠনের আদলটাও প্রায় একই রকম।

অতএব নভস্থিত মহাজাগতিক বস্তুদের ব্যাপারে এবারে একটু পর্যালোচনা করবার সময় এলো। এই অনন্ত মহাশূণ্যে ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি নক্ষত্র এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে যে বিপুল পরিমাণ 'মহাজাগতিক বস্তু'-র সংখ্যাটা তৈরি হ'ল, তারা প্রত্যেকে নিশ্চয়ই মহাজাগতিক রীতিনীতি মেনেই চলাফেরা ও ঘোরাঘুরি করছে। এবং এটাও হয়তো ঠিক যে কোন ভাবেই এদের কারো সঙ্গে কারোও কোন সংঘর্ষ ঘটছে না। হচ্ছে না কোন দুর্ঘটনা। তাই যদি হয়, তবে 'উল্কাপাত'-টি কি জিনিস? এটা কি নভস্থিত কোন দুর্ঘটনা? আচ্ছা, এটা কি ধরেই নেওয়া যেতে পারে যে, যে কোন মুহূর্তে, যে কোন অবস্থানে, এবং অজানা কোন বিশেষ কারণে, কিছু না কিছু দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এই নভোমণ্ডলে।

এসবের মধ্যে আর কত ভেতরে ঢুকব বুঝতে পারছি না। কখনও দেখছি চারিধার অন্ধকার, আবার কখনও বিশাল এক অখণ্ড আলোর বিচ্ছুরণ। চোখ ধাঁ ধাঁ করছে। আবার পরমুহূর্তেই সব অন্ধকার। জীবজন্তু ও জনমানবশূন্য বিপুল এক মহাশূণ্যের মাঝখানে ভেসে বেড়াতে বেশ লাগছে। মনে হচ্ছে আমি আর আমার মধ্যে নেই। জানিনা, মহাভারতের মহাবীর অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে 'বিশ্বরূপ' দেখিয়েছিলেন সেটার সঙ্গে এটার বিন্দুমাত্রও কোন মিল আছে কিনা!

তাহলে, এমনও তো হতে পারে, এই সমস্ত দুর্ঘটনার মত কিছু একটা 'অঘটন' মহাশূণ্যে ওলট পালট খেতে খেতে অনাবশ্যকভাবে 'পৃথিবী'-র ওপর আছড়ে পড়েছে। আকস্মিকভাবে পথ হারিয়ে, পিছলিয়ে তো অনেক কিছুই ঘটে যায়। বলা যায় কি, আজকে 'পৃথিবী'-র এই দুর্দশা এইরকমই কোনও না কোন এক গ্রহ-গ্রহান্তরের নভস্থিত বস্তুর পক্ষাঘাতগ্রস্ত বিষপাত্রের সুধা কিনা?

একটু ভেবে দেখতে সকলকে অনুরোধ করি।

পরেশ নাথ রায়

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে দীর্ঘ ৩৬ বছর চাকরির পর ২০১১ সালে অবসর গ্রহণ।

বর্তমানে 'অতিমারী'তে উড়ানের অভাবে নিউ ইয়র্কে ছোট কন্যা রুনিয়া রায় (বিঙ্গহামটন বিশ্ববিদ্যালয় এ পাঠরত) এবং বড় কন্যা জিনিয়া রায় এর সঙ্গে সস্ত্রীক অবস্থান।

ভাড়াবাড়ির কথা

দেবায়ন চৌধুরী

ঠিকানা ভাড়া। ঠিকানা বদল। যৌথ পরিবার থেকে বাবা আলাদা হল। একদিন মা আর আমাকে ঘর দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল বাবা। ঘরে ছিল একটি চৌকি আর আলনা। ডোডেয়ারহাট থেকে কেনা। চার বছর বয়সে আমি ভর্তি হলাম বোধোদয় শিশু নিকেতনে। তাড়াতাড়ি স্কুলে পাঠানো হল। সারাদিন কি করব বাড়িতে? ঘরের উল্টোদিকেই বিশাল পুকুর। গায়ে বাঁশের চাকার। উঠোন থেকে হাঁসেরা তড়তড় করে নেমে যায় জলে। আমি হাঁসের পেছনে দৌড়োতে দৌড়োতে থেমে যাই। মা ভয় পায় সবসময়। যদি জলে ডুবে মরে যাই! মরা কাকে বলে অবশ্য জানিবি তখনও। মনে পড়ছে একবার আমাদের বাড়ি থেকে পাশের বাড়িতে ছুটছি, সেই সময় 'বলো হরি হরি বোল' শুনে ভয়ে ভয়েই দুটো সুপারি গাছের মধ্য দিয়ে দেখে ফেললাম—শুয়ে শুয়ে কে যেন যাচ্ছে। আকাশের দিকে মুখ। ভেতরটা ছ্যাঁত করে উঠেছিল। বিকেল গড়িয়ে যাওয়া নিস্তব্ধতার মধ্যে হরি ধ্বনি মিলিয়েও মিলিয়ে যাচ্ছিল না। তারপর অনেক দূর থেকে হরি ধ্বনি শুনলেই মায়ের কাছে ছুটে চলে যেতাম। খাবার সময় এই বোল শুনলে পাতের নিচে জল দিতে হয়। সেদিন খাওয়া আর জমত না। মা অস্ফুটস্বরে বলত- কে যে গেল! খুব শীতের রাতে কেউ মারা গেছে শুনলেই আমাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেত—বাড়ির লোকের খুব কষ্ট।

ভাড়াবাড়িতে এসে মা কেমন শান্ত আর নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। কয়লায় উনুনে হাওয়া করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে যেত। আমি বলতাম—মা, পড়া হয়ে গেছে। এমনিতেই বেশিক্ষণ একভাবে বসতে ভালো লাগে না। অবশ্য গল্প শুনলে তাও শান্ত হয়ে থাকা যায়। কিন্তু... যে নতুন পাড়ায় গিয়েছি সেখানে আগের মতো ঘুরতে যাওয়া যায় না, আর সাক্ষাৎকারের পর্ব তো রয়েছেই। বাবাকে বিশেষ কেউ এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে না। মাকে দেখেই লোকজনের প্রশ্নবাণ— ও বউমা, বাড়ি ছাড়লে কেন? এই প্রশ্ন তারপরেও এক যুগ ধরে শুনতে হয়েছে। মায়ের উত্তরের মধ্যে বিষণ্ণতার ডালপালা— সাধ করে কেউ বাড়ি ছাড়ে বলুন?

বাবা নতুন বাড়িতে এসেও আগের মতোই আছে। বাড়িতে একদম সময় দেয় না। ভোট চলে গেল। আর এই সূত্রে একটু আধটু পাড়া বেড়ানোর সুযোগ ঘটল আমার। রাতে খাওয়াদাওয়া শেষ করে মা আঠা বানিয়ে দেয়। পাড়ার কয়েকজন দাদা-দিদিরা আসে। আমি পোস্টারগুলো গোছাই। কিছু লুকিয়েও রাখি। ভোট মিটে গেলে সব হাত চিহ্ন আমার হয়ে যায়!

তিনজনের ছোট পরিবারের কাজ মিটে যায় তাড়াতাড়ি। মা পাশের বাড়িতে টুকটাক যাতায়াত শুরু করেছে। পান খাওয়ার অভ্যেস হয়েছে। উলের কাঁটায় সোয়েটার বোনে কেউ কেউ। মা দেখে। এরমধ্যেই শীত পড়ে যায় খুব। পিকনিক হয় মাঝেমাঝেই। আমাদের কেউ বলে না। বাবা ভরসা দিয়েছে – আরো কদিন যাক। তারপর ঠিক বলবে।

বাড়িওয়ালার মা-কে মাঝেমধ্যে দেখাশোনার ভার আমাদের ওপর ন্যস্ত হয়। তিনি আমাকে খুব হাঁক-ডাক করেন। ভালোবাসা পেলে ভালোলাগে। আমার ঠাম্মার কথা খুব মনে পড়ে। ঠাম্মার গায়ে নরম সাদা থানের আশ্চর্য সুন্দর গন্ধ। কতদিন দলামাখা খাইনি! মানে ঠাম্মা দুপুরবেলায় আতপ চালের ভাত, নিরামিষ তরকারি সব একসঙ্গে মেখে একটা গোল্লা পাকিয়ে আমায় দিত। জলের গ্লাসে তুলসীপাতার সাঁতার দেখতাম। ঠাম্মা একদিনও আসেনি আমাদের ভাড়াবাড়িতে। আদৌ আসবে কিনা কে জানে!

ভাড়াবাড়িতে এসে আমরা অনেক কিছু শিখেছি। যেমন কেউ আমাদের বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করলে বলতে হয় আমরা ভাড়াবাড়িতে থাকি। বাড়িওয়ালার পুরো নাম মনে রাখতে হয়েছে। এই বাড়ি যখন বেশ

ভালো লাগতে শুরু করেছে, রান্নাঘরের পাশে একটু এগিয়ে আবিষ্কার করেছি পাখির বাসা, তখন আবার একদিন হন্তদন্ত হয়ে বাবা বলল—একটা ভালো বাড়ি পেয়েছি। দুটো শোবার ঘর। রান্নার জায়গা। আর বারান্দা। মা আবার বিছানার চাদরে জিনিস গুটোতে থাকে। তোশকের নিচের থেকে বেরোয় চালের বস্তা। জিনিসপত্রের শব্দে চিন্তারা দানা বাঁধে না। মা ভাবতে থাকে কত কিছু আবার হারিয়ে যাবে। বাবা চিন্তা করছে নতুন যা যা কিনতে হবে সেগুলোও বেশ ঝক্কির। আর আমি ভাবছি নতুন জায়গায় গেলে আমার বন্ধু কে হবে। স্কুলের পথ বেড়ে গেল। বড়ো হচ্ছি বলে সোনা মাস্টারমশাই বলেছে মায়ের কোলে না চড়তে। আমাকে কোলে নিতে মায়ের কষ্ট হয় বুঝি, কিন্তু...

বাড়ি বদলে যায়। স্কুলও। খুব তাড়াতাড়ি এই ভাড়াবাড়ি ভালো লাগে। কত মানুষ একসঙ্গে থাকে এক উঠোন ঘিরে! আমাদের ঘরের পাশেই একটা ঘরে ব্যাগ তৈরি হয়। বড়ো দাদারা খুব মিশুকে। আমি তাদের ন্যাওটা হয়ে পড়ি। প্রাইমারি স্কুলে আমাকে সবাই বেশ পাত্তা দেয়। প্রাইভেট স্কুল থেকে এসেছি যে!

বড়ো হতে থাকি। প্রথম প্রথম বন্ধুদের খেলা দেখতাম জুলজুল করে। এখন ওদের বাড়ি থেকে ডেকেও আনতে পারি। বাবু আমার জন্য স্কুলের প্রথম বেঞ্চে জায়গা রাখে। খেলার বল এখন অন্যরা আমার জিম্মায় দেয়, ভরসা করে বুঝি। বাড়িওয়ালাদের আত্মীয়রা আমাদের নিমন্ত্রণ করে। রাসমেলার জিলিপি পরদিন সকালে সবাই মিলে খাওয়া হয়। ঘরে ঘরে বাটি চালান। জেঠিমনি কাঁঠাল ভেঙে বাবু বলে ডাক দেয়। আমি মুড়ির বাটিতে অনেক পরিমাণে রস নিয়ে আসি। চালুনের মধ্য থেকে আঙুলের স্পর্শে স্নেহ ঝরে পড়তে থাকে। আমার শৈশব...

ঝঞ্ঝাট যে একেবারে হয় না, তা নয় কিন্তু। বাড়িওয়ালা মাঝেমাঝে লাইটের হিসেব করে। ভাড়া নিয়ে শুনিয়ে শুনিয়ে দু-এক কথা বলে। বাথরুমে লাইন পড়লে সতর্ক থাকতে হয়। ভাড়াটিয়ার থেকে বাড়িওয়ালাদের সম্মান, প্রতিপত্তি সব বেশি। এটা বুঝেছি নিজের মতোই। মা মাঝেমাঝে বলে অসহায়ভাবে— বুঝিস তো সব। হ্যাঁ, আমি সব বুঝি। শুধু বল করে যাই। ব্যাটিং না পেলেও। মা-কে কখনও নালিশ করি। মা বলে—যা ওই বাড়ি থেকে ঘুরে আয়। ওই বাড়ি মানে আমার ঠাকুরদার বাড়ি। বাবার বাড়ি। আমরা তিনজন যে ঘরে থাকতাম, সেটা ভেঙে ফেলা হয়েছে। আমি কাজ দেখি মিস্ত্রিদের। ধুলো উড়ে এলে চোখ খচ্‌খচ্‌ করে। শুনতে পাই—বাবু সরে যাও। সর্দি লাগবে।

এভাবে থাকা যায় নাকি—কতবার এই কথা মনে আসে আমাদের। তবুও আমরা থেকে যাই। বছর আসে। বছর যায়। বাড়িতে কেউ নতুন এলে আমাদের দেখে যখন অবাক হয়, আমরাই বলে দিই—আমরা ভাড়া থাকি এখানে। আর পাড়ায় আমাদের খোঁজ করলে বাসিন্দাদের কেউ কেউ বিরক্ত হয়েই বলে—বলবেন তো ভাড়া থাকে! সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিছু পরিচিতি বেড়ে যায় অবশ্য। কিন্তু ওই দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মতো ভাষাতীত অবস্থার খুব বেশি ফারাক হয় না। মনে রাখতেই হয় এই ধুলো-মাটি-আলো-বাতাসের অধিকার শর্তসাপেক্ষ। যদি কোনোদিন উঠে যেতে বলে, চলে যেতে হবে।

জীবনের কুড়ি বছর চলে গেছে ভাড়াবাড়িতে। স্মৃতির অ্যালবামে কত কত ছবি। মিলিদির বিয়ে হল। জামাইবাবু মানসদা, কুট্টিদার সঙ্গে আমাকেও নিয়ে গেল মুনলাইট সার্কাস দেখাতে। আমার নিজের দিদি ছিল না। তাই শ্রীদিরাই ফোঁটা দিত প্রতিবার। পুজোর সময় ঘুরতে যাওয়া সদলবলে। একটা রিকশায় চারজন মিলে বাড়ি ফেরার সেইসব দিনে ভুলেও যেতাম আনন্দে, আমরা ভাড়া থাকি। মনে হত—এরাই আমার আত্মীয়।

মায়ের উৎসাহে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কবিতা বলি, তবলা বাজাই। বাবা মাঝেমধ্যে রাতে মদ খেয়ে জোরে জোরে কথা বলে। আমার লজ্জা লাগে খুব। জেঠিমনিরা শুনে ফেলবে যে! মা বলে—তুই এত ভাবিস না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারিস।

নিজের পায়ে দাঁড়ানো মানে যে বাড়ি করাও, বুঝতে পেরেছিলাম হয়তো। যাইহোক, প্রতিবার বাড়ি ছেড়ে আসার সময় ঘর পরিষ্কার করে দিয়ে আসতে হত। একেবারে শেষ পর্বে মা, বাবা বলত-- আমাদের কোনও ব্যবহারে খারাপ পেলে... এবার সবার চোখের কোণ ভিজে যেত। হু হু করে বাতাস বইত মনখারাপের। নতুন বাড়িতে এসে আবার পুরোনো ভাড়াবাড়ির জন্য মন উচাটন। ছেড়ে আসা ঘরে বুঝি কত কিছু থেকে যায়। ধুলোর পাহাড়ে যাপনের চালচিত্র।

ডাকঘরে গিয়ে জানিয়ে দিই এখন আর ওখানে গেলে আমাদের পাবেন না। বুঝিয়ে বলি নতুন ঠিকানা...

আবার সব নতুন করে শুরু করতে হবে। কোন সুইচে কোন বাতি জ্বলে অভ্যেস হয়ে যাবে আবার। মনখারাপ করে কোনো লাভ নেই। তবু মনখারাপ করে বইকি। আর হ্যাঁ, পুজোর সময় পুরোনো পাড়াতেই আড্ডা দেব। আর মা দুর্গাকে বলব— যদি ভেসে বেড়ানোর জীবন দিলে ঈশ্বর, অলৌকিক মায়া কাটানোর কোনও অস্ত্র দিলে না কেন?

দেবায়ন চৌধুরী

জন্ম- ১৯৮৭, ১ এপ্রিল। পেশা- অধ্যাপনা। কবিতার বই- 'যা কিছু আজ ব্যক্তিগত'। সম্পাদিত গ্রন্থ- 'দুর্গামঙ্গল', 'কোচবিহার দর্পণ : নির্বাচিত প্রবন্ধ ১', 'কোচবিহারের রাণী নিরুপমা দেবীর নির্বাচিত রচনা', 'কোচবিহারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ', যুগ্মভাবে 'কোচবিহার : ইতিহাস ও সাহিত্য' ও 'সাধক কবি রামপ্রসাদ'। গল্পের ই-বুক- 'এমনি বহে ধারা'।

গৌতম সরকার

“লংকার-তরকারি”

ইউরোপ, অ্যামেরিকা, বা অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ঘোরার পর রাজস্থানের পুষ্করে এসে মনে হোলো যে এর মতো জায়গা পাওয়া দুষ্কর! ‘রাজস্থান’ নামটা শুনলে (মায় ‘ভারতবর্ষ’ নামটাও!), আমি আমার মানসচক্ষে যা দেখতে পাই তা হোল একটা ‘রত্ন-ভাণ্ডার’ বা প্রকারান্তরে একটা ‘জুয়েলারি-বক্স’; তবে বেশ নোংরা, এই যা! তা জুয়েলারি-বক্সেও ধুলো পড়ে বৈ কি!

রাজস্থানের আনাচ-কানাচ বা সর্বত্রই যেন মনি-মুক্ত খচিত। এই প্রাসাদ, তো সেই কেল্লা; এই মন্দির, তো সেই সমাধি; এই হ্রদ, তো সেই দীঘি – সর্বত্র ছড়ানো। আর আছে হরেক রকম সংস্কৃতি, যা বদলে যায় থেকে থেকেই, কয়েক কিলোমিটার অন্তর অন্তর। আর এইসবের কিছুই যদি পছন্দ না হয়, তাহলে শুধু যেতে হবে পুব থেকে পশ্চিমে, আর দেখা যাবে সবুজের সমারোহ কেমন ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে রুক্ষ মরুভূমিতে। এ হেন রাজস্থানেই আবার পাওয়া যায় আর একটা জিনিস - ‘লংকার-তরকারি’।

লংকা তো আমরা ভারতীয়-উপমহাদেশের লোকেরা কম-বেশী সকলেই খাই; এই ফোড়নে বা সেই তরকারিতে, এই ঝোলে না হয় সেই ঝালে। কিন্তু তাই বলে তরকারির পুরোটাই শুধুই লংকা? তেমনটা আগে কখনো শুনিনি। তবে তা খাওয়ার সুযোগ হয়েছিলো আমার এক বন্ধুর সাথে। মায় বন্ধুর সাথে বন্ধুত্বটাই হয়েছে এই লংকার-তরকারিকে কেন্দ্র করে!

বিকানির থেকে ফিরছিলাম ট্রেনে। উদ্দেশ্য দিল্লী, আর সেখান থেকে উত্তর ভারত। ট্রেনে রাত্তির হবার বেশ আগেই ক্যাটারারদের একজন রাতের খাবারের অর্ডার নিতে এল। আমি যথারীতি এড়িয়ে গেলাম, খাবারের ‘হাইজিন’কে প্রশ্ন করে। আমার উল্টোদিকে বসা একজন জিগ্যেস করলেন যে কি ব্যাপার, খাব কি? ওর সাথে পরিচয় হোল, জানালাম যে ও বিকানিরের ছেলে, দিল্লী আই.আই.টি তে পড়ে, ছুটি কাটিয়ে বাড়ি থেকে ফেরত যাচ্ছে। জানালাম যে আমার কি হাল! বেশ কয়েকবার নিজের দেশে এসে নিজের পছন্দের খাওয়ার খেয়েই উল্টেছি, তাই মনে ভয়! একা একা ঘুরি, কোথাও উল্টে গেলে? তাই এদিক-ওদিক খাওয়া বাদ।

ও প্রস্তাব দিল যে আমি নির্ভয়ে ওর সাথে আনা খাবার খেতে পারি। খাবার স্বয়ং ওর নিজের মায়ের হাতের তৈরি, ওদের বিকানিরের বাড়িতে; তবে খাবারে যে মাছি বসেনি তার একশো ভাগ নিশ্চয়তা ও দিতে পারবে না! সাহস করে রাজী হয়ে গেলাম। বদলে ওর আবদার এই যে ওকে আমার পাসপোর্টটা একবার দেখতে দিতে হবে, ও একটু দেখতে চায় যে বিভিন্ন দেশের ভিসা-স্ট্যাম্পগুলো কেমন দেখতে হয়!

ও যে নিরামিষাশী তা আগেই জানিয়েছিল, তবে পোঁটলা থেকে ও যে খাবার বার করলো তার জন্য আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। রুটিটা দেখে ঠিকঠাকই মনে হোল, তবে তা খেতে হবে যা দিয়ে তা দেখেই অবাক হয়ে গেলাম – এক খাবলা কাঁচা লংকা, তবে তা রীতিমত রান্না করা! রান্নার সময় তাতে বোধহয় শুধুমাত্র দেওয়া হয়েছে নুন আর জিরের গুড়ো!

অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। ভাবলাম যে এ কি বিড়ম্বনা, এতে মাছি না বসে থাকলেও এত লংকা খেলে তো নির্ঘাত উল্টে যাব; আজ রাত্তিরে না হোক, কাল সকালে তো বটেই! দেখলাম যে ও দিব্যি চেটে-পুটে খাচ্ছে। জিগ্যেস করলাম যে ওর ঝাল লাগে না? ও বলল যে খেয়েই দেখ না। সাহস করে একটু মুখে দিতেই আমার গলা-বুক একেবারে জ্বলে গেলো। আর খেতে পারলাম না।

আমাদের বন্ধুত্ব আজও অটুট, ফেসবুকে কথা হয় মাঝে-সাঝেই। ওর থেকে আমি শিখি হিন্দি, আর ও আমার থেকে ইংরিজি। পরে একবার দিল্লী গিয়ে ওর সাথে দেখাও করে এসেছি, সাথে দিল্লী আই.আই.টির ক্যাম্পাসও। আজ ওর সাথে ফেসবুকে কথা হবার পরেই ভাবলাম যে ঐ লংকার তরকারি বানালে কেমন হয়? একটু রয়ে-সয়ে লংকার বদলে ব্যাবহার করলাম ক্যাপ্সিকাম (বেল-পেপার), আর নুন-জিরের সাথে অন্য কিছু মশলাও। মন্দ হয়নি।

Born and raised in Kolkata, Gautam Sarkar moved to the US for higher education in chemistry. Besides being a university faculty, Gautam enjoys travelling and writing. He has contributed his articles to 'Anjali' over the past several years; primarily describing his various experiences in the US and in India, as well as in elsewhere where he has traveled to.

দিউ সুন্দরী

সুবীর বোস

২০২০র জানুয়ারিতে ঘুরে এলাম দিউ। সোমনাথ থেকে ৯০-৯২ কিলোমিটার রাস্তা। ট্রান্সপোর্ট বলতে লোকাল বাস অথবা ভাড়া করা গাড়ি। সোমনাথ থেকে গাড়িতে দিউ যেতে গেলে ভাড়া পড়বে ২,০০০ থেকে ২,২০০ টাকা এবং দিউ পৌঁছতে সময় লাগবে ঘন্টা দুয়েক। দিউতে একটা ছোট্ট এয়ারপোর্ট আছে যেখানে মুম্বাই থেকে উড়োজাহাজে এক ঘন্টা দশ-পনের মিনিট লাগে পৌঁছতে।

আমরাও ওই ঘন্টা দুয়েক মাথায় রেখে গাড়ি নিয়ে চললাম দিউর পথে। প্রথম দিকে রাস্তা খুব খারাপ – পরে দিউর কাছাকাছি এলে রাস্তা একদম ঝাঁ চকচকে। মাঝে – যেমনটা হয় রাস্তার ধারে কয়েকটা ধাবা পাবেন যেখানে কফি, পকোড়া, আলু পরাঠার সদগতি করে ফের দিউর পথে...।

হাজার পঞ্চাশেক লোক বাস করা দিউতে ঢোকার মুখে একটা বড় গেট আছে – মানে গেটওয়ে অফ দিউ আর কি! দিউতে ঢোকার পর বেশ গোছানো রাস্তার দু' পাশে বড় বড় সরকারি অফিস, হাসপাতাল, লোকজনের হাসিমুখ, তাঁদের আত্মবিশ্বাসী চলাফেরা ভাবতে বাধ্য করবে যে আপনি ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেছেন। দিউতে ঢোকার পরই আমাদের গাড়ির ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল,হোটেল বুক করা আছে? বললাম, হ্যাঁ, মার্কেট এরিয়াতে হোটেল দ্য গ্র্যান্ড হাইনেস বুক করেছি। ড্রাইভার বলল, ঠিক জায়গায় বুক করেছেন।

মনে হতেই পারে যে ড্রাইভার বলল, ঠিক জায়গায় বুক করেছেন আর সেটাই বিশ্বাস করতে হবে! আসলে ড্রাইভারের এই "ঠিক" ভাবনার সঙ্গে একটা অন্য ভাবনা কাজ করেছে। আরও অনেক বীচ থাকলেও আসলে দিউতে বিখ্যাত বীচ বলতে নাগোয়া বীচ আর ঠিক তার গায়েই আছে রাধিকা বীচ রিসোর্ট - যেখানে ভাড়া শুরু হয়েছে দিনপ্রতি ৫,০০০ টাকা + ট্যাক্স দিয়ে, আর আছে আরও দু' চারটে অমনতর রিসোর্ট বা হোটেল। মনে হতে পারে – তাতে কি! ঠিক হিসেবে এখানে সমুদ্রের কাছে থাকাটাই তো দস্তুর। এখানেই আসল টুইস্ট। রিসোর্টের ভাড়াটা সামাল দেওয়া গেলেও মুশকিল অন্য জায়গায়। সন্ধ্যার পর জায়গাটা – আমাদের ড্রাইভারের ভাষায়, বিলকুল সান্নাটা। আমিও খোঁজ-খবর নিয়ে "ও সব" ভেবেই মার্কেট এরিয়াতে হোটেল বুক করেছিলাম। গ্র্যান্ড হাইনেস হোটেলটা নতুন, বিল্ডিং নতুন, রিভিউ ভালো দেখাচ্ছিল এবং ভাড়াও খুব বেশি নয় বলে আমার অন্তত মনে হয়েছিল। এখানে আমরা দু' রাত ছিলাম ওদের প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুটে। দু'দিনের ভাড়া হাজার আটেক টাকা লেগেছিল। বিভিন্ন সুবিধার সঙ্গে আমরা দুটো ব্যালকনি পেয়েছিলাম যার একটা থেকে অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখতে পেতাম সুন্দরী দিউকে এবং তার মোলায়েম প্রাকৃতিক অবস্থানকে। এখানে ডালপালা বেয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার পর দেখেছি দূরে খাড়ির উপরে ঝুঁকে পড়া সেতুতে আলোর চলাফেরা – যেন বসন্তের পেতে রাখা আসন ! এক কথায় চুটিয়ে উপভোগ করেছি দু' দিনের এই হোটেলবাস।

মার্কেট এরিয়ায় থাকার সুবিধা হল আপনি দিনে তো বটেই এমনকি রাতেও কাছাকাছি জায়গাগুলো এক্সপ্লোর করতে পারবেন, যে হোটেলে আছেন তার খাবারের দাম বেশি মনে হলে কাছেই অনেক কমদামি ভালো রেস্তোরাঁ পেয়ে যাবেন। আমরা যেমন সন্ধ্যা নাগাদ বাজার লাগোয়া দোকানগুলো থেকে ডিম টোস্ট, বিভিন্ন রকম ভাজাভুজি, এমনকি ফুচকাও চেখে দেখেছি। এ ছাড়া এখানে গায়ে গায়ে প্রচুর খাবার হোটেল আছে।

আমরা একদিন চিকেন ট্রাই করলেও বেশি নজর দিয়েছি গুজরাটি খাবারের উপর। বড্ড ভালো এখানকার গুজরাটি মীল। দাম ওই ১২০ টাকার কাছাকাছি।

দিউ গুজরাট লাগোয়া বলেই এখানকার ভাষাটা মূলত গুজরাটি বলেই মনে হল। গুজরাটে যেহেতু মদ নিষিদ্ধ গুজরাট থেকে “লোকজন” উইক এন্ডে দিউতে এসে ভিড় করে “তরলের” আশায়। এখানে কুড়ি পা হাঁটলে আপনার চোখের সামনে দু’ চারটে মদের দোকান উঁকি মেরে যাবে। সে জন্যেই কিনা জানি না – স্থানীয়দের কথায়, দারু ছোড়কে সব ম্যাহেঙ্গা। আমাদের মুশকিল হল আমরা আবার “ও রসে” বঞ্চিত। ফলে সকাল বা সন্ধ্যায় যতটা পেরেছি ঘুরে নিয়েছি আর কি! আরও যেটা জানানোর সেটা হল মার্কেট এরিয়াতে থাকবার মতো অনেক ভালো ভালো হোটেল আছে। ফলে আগে থেকে বুক না করে এলেও হোটেল পাওয়া সমস্যা হবে না বলেই মনে হয়।

প্রথম দিন বিকেল নাগাদ বেরোলাম এলাকায় টহল দিতে। মার্কেট এরিয়াতে সমুদ্রর বদলে খাড়ির উপস্থিতি আছে আর আছে মাছ ধরার আধুনিক আয়োজন। মেশিনে বরফ গুঁড়ো করা থেকে সেই বরফ কীভাবে মাছ সংরক্ষণে ছড়িয়ে দেওয়া হয় কাছ থেকে দেখলাম। এরপর পাশেই একটা পার্কের মতো জায়গায় – যেখানে একটা মেলা হচ্ছিল ঢুঁ মারলাম। মেলায় যাবেন, সঙ্গে আপনার “উনি” – কেনাকাটা হবে না তা কখনও হয় নাকি! কেনাকাটার ফাঁকে আমি এক রাউন্ড চা, এক রাউন্ড কফি সাবাড় করে মন দিলাম দাম মেটাতে।

দিউতে দেখবার মতো জায়গা বলতে দিউ ফোর্ট, দিউ চার্চ, দিউ মিউজিয়াম, নায়ডা কেভ, গঙ্গেশ্বর মন্দির,নাগোয়া বীচ ইত্যাদি। আমরা যখন গেছি (জানুয়ারি, ২০২০) আই.এন.এস. খুকরি মেমোরিয়াল যাওয়া বন্ধ ছিল রাস্তা খারাপ থাকার জন্য। আপনি যদি মার্কেট এরিয়া থেকে অটো ভাড়া করেন ওই সব স্পটগুলো ঘুরে আসার জন্য ভাড়া পড়বে ৬০০ টাকার মতো। বলে রাখা ভালো, খুব বেশি সময় লাগে না সব ক’টা স্পট ঘুরে আসতে কারণ স্পটগুলো একটার থেকে আরেকটার দূরত্ব খুব বেশি নয়।

পর্তুগীজদের তৈরি দিউ ফোর্টেই সবচে’ বেশি সময় লাগে পুরোটা ঘুরে দেখতে। সমুদ্রের গায়ে হেলান দিয়ে আছে এই পুরোনো দিনের কেল্লা। ছবি তোলার পক্ষে আদর্শ জায়গা। পুরো ফোর্ট ঘুরতে গেলে বেশ চড়াই-উতরাই আছে। বয়স্ক লোকজনের পক্ষে পুরো ফোর্ট ঘুরে দেখা একটু চাপের বলেই আমার অন্তত মনে হয়েছে। দিউ ফোর্ট থেকে সামান্য দূরেই দিউ চার্চ। এই চার্চও পর্তুগীজদের তৈরি। দিউ সেন্ট পল’স চার্চের ভিতরটা অন্যান্য চার্চের মতো খুব স্নিগ্ধ এবং সুন্দর। এখানে ছবি তোলায় কোনও বারণ নেই। ভিতরে কিছুক্ষণ থাকতে ভালোই লাগে। হালকা আলো-আঁধারির ঘেরাটোপে আমরা কিছু ছবি তুলে নিলাম।

পরবর্তী গন্তব্য দিউ মিউজিয়াম – যা কিনা আগে ছিল একটা চার্চ। দিউ মিউজিয়ামে কিন্তু ছবি তোলা বারণ। আর ছবি তুলবেনই বা কীসের। পরিষ্কার বোঝা যায় অনাদরে পড়ে থাকা কিছু কাঠের মূর্তি, প্রায় নষ্ট হয়ে যাওয়া কিছু পেইন্টিংস এখন প্রায় স্থানীয় পাখিদের ঘরবাড়ি হয়ে উঠেছে। মিউজিয়ামে ঢোকার মুখে দেখলাম একজন বসে আছে উদাসীন। একদা অসাধারণ, এখন একেবারেই খারাপ অবস্থায় থাকা এই স্থাপত্যকে মিউজিয়াম হিসেবে মেনে নিতে একটু সেন কষ্টই হয়। সে যাক, চার্চ বা মিউজিয়াম ঘুরে দেখতে খুব বেশি সময় লাগে না। অবশ্য পুরোনো ইতিহাস বা তার ছোঁয়া লাগা ছবি যাঁরা খুঁটিয়ে দেখতে বা উপভোগ করতে

চান তাঁদের কথা আলাদা। নায়ডা কেভ কিন্তু আমার দারুণ লেগেছে। কেউ বলেন, “ইহা” মানুষের তৈরি, কেউ বলেন,না, ইহা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক। বিশ্বাস করা হয় এখান থেকেই “মাল-মশলা” নিয়ে দিউ ফোর্ট তৈরি হয়েছে আর এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই জন্ম দিয়েছে নায়ডা কেভের। মনে আছে একদম প্রথম গুহার একটা প্রান্তে গিয়ে যখন চোখে পড়ল আগাছার ভিতর দিয়ে “চলে চলে ঘাস উঠে পায়ে চলা পথ” হয়ে রয়েছে এক কোণে – আমার “উনি”কে বলেছিলাম, চলো, এ পথেই যাব। একটু কিন্তু কিন্তু করে আমরা সে পথ দিয়ে পৌঁছেছিলাম আরেকটা অপূর্ব গুহার মুখে। মানে বলতে চাইছি এখানে একটু এলোমেলো ঘুরতে পারলে বেশি ভালো লাগবে। আর হ্যাঁ,এখানে এলে ডাব খেতে ভুলবেন না। কুড়ি টাকায় মন ভরে যাবে।

গঙ্গেশ্বর মন্দিরের আসল টান জোয়ারের সময় – যখন জোয়ারের জল এসে মন্দিরের ভিতরে থাকা শিবলিঙ্গগুলোকে ধুইয়ে দিয়ে যায় আর পাশ থেকে আওয়াজ ওঠে, হর হর মহাদেব। আমরা জোয়ার পাইনি, মন্দিরের ভিতরের ভালো ছবি পেয়েছি, উপভোগ করেছি মন্দির লাগোয়া বোল্ডারে বসে সমুদ্রের আয়োজন। চমৎকার জায়গা।

এবং নাগোয়া বীচ। দিউর একমাত্র এবং ছোট্ট এয়ারপোর্ট পেরিয়ে পৌঁছলাম নাগোয়া বীচ। পরিষ্কার বীচ। দীর্ঘ বীচ। দেশের অন্যান্য বীচে যেমন দোকান-পাট সাজানো থাকে এখানে তেমন কিছু নেই। একটু যেন নিরিবিলি। ভালো লাগবে। ছোট থেকে বড় – সবার জন্য এখানে আয়োজন আছে ওয়াটার স্পোর্টসের। আমরা যেদিন গেছি খুব বেশি লোকজন চোখে পড়ল না। তবে চোখে পড়ল

রাধিকা বীচ রিসোর্ট উজিয়ে আছে বীচের খুব কাছাকাছি। বেশ কিছুক্ষণ এই বীচে কাটিয়ে খোঁজ করলাম যদি এক কাপ চা পাওয়া যায়। কপাল মন্দ। এদিক-সেদিক হন্যে হয়ে আধ ঘন্টা টাক্ খুঁজেও এক কাপ চা না পেয়ে মনে হল – দিনের বেলাতেই এই – রাত্তিরে তো – আমাদের ড্রাইভারই হয়ত ঠিক – বিলকুল সান্নাটা।

দিউকে অনেকেই আদর করে নাম দিয়েছেন “মিনি গোয়া”। আমার কিন্তু তা মনে হয়নি। আমি দু’বার গোয়া গেছি। আমার মনে হয়েছে যে টুকু মিল তা ওই সস্তার “তরলে”। তবে সৌন্দর্যের বিচারে গোয়া এগিয়ে থাকলেও দিউ সুন্দরী আপনাকে হতাশ করবে না এটুকু বলতে পারি।

সুবীর বোস

নিজের কথা: সময় পেলে কিছু লেখালিখির চেষ্টা করি। কিছু ছাপা হয় –
কিছু চাপা পড়ে থাকে আমার কম্পিউটারে এবং সময়ে-সময়ে তারা হারিয়েও যায়।
কবিতা যে সব পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে –
দেশ, কৃত্তিবাস, কৌরব, পরবাস, কবি সম্মেলন ইত্যাদি;
গল্প যে সব পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে –
দেশ, আনন্দবাজার রবিবাসরীয়, আনন্দমেলা, সানন্দা, উনিশ-কুড়ি, শুকতারা , পরবাস ইত্যাদি;
ভ্রমণ কাহিনি প্রকাশিত হয়েছে পরবাস এবং অবসর ওয়েব ম্যাগাজিনে।

ভূত

সুশোভিতা মুখার্জী

কয়েক বছর আগের ঘটনা লিখতে চলেছি। জুলাই মাসের শনিবারের সকাল, প্রচণ্ড ভ্যাপসা গরম। ড্রাইভওয়ে তে ডিম ফাটালে অনায়াসে ভেজে নেওয়া যাবে। ডাক্তারবাবু হাঁসপাতালে গিয়েছেন। সকালে চা খেয়ে ভাবলাম বাড়ির পিছনের বাগানে জল দিয়ে আসি । বিকেলে পার্টি আছে সময় হবেনা । ভারতীয়রা যাঁরা আমেরিকায় থাকেন তাঁরা অনেকেই গরমকালে ব্যাকইয়ার্ড-এ নানারকম সবজির গাছ করে থাকেন, যেমন লাউ , উচ্ছে, টমেটো, ধনেপাতা ইত্যাদি । সেইসব শাকসবজি তুলে এনে রান্না করে পার্টিতে খেতে দিলে খুব বাহবা পাওয়া যায় । সে বছর ডাক্তারবাবুর শখ হল নিজের বাগানের লাউটা কুমড়োটা খাবেন । বললেন এতবড় বাগান রয়েছে, কিছু লাগাতে পারো তো ? সত্যি কথা বলব কি কর্তার কথাটা আমার খুব একটা মনঃপুত হয়নি । দু চারটে লাউ কুমড়োর জন্যে খেটে মরতে হবে, হাঁটুর অবস্থাও খুব একটা ভাল নয়। তবু ভাবলাম, একবার চেষ্টা করেই দেখা যাক না । প্রতিবেশী লক্ষ্মীর সাথে কথা বলতেই তিনি লাফিয়ে উঠলেন। তাঁরও শাকসবজির খুব শখ এবং বাগান করে থাকেন প্রতি বছর । লাউ , উচ্ছে, কুমড়োর বীচি নিয়ে একদিন দুপুরে এসে হাজির হলেন। দুজনে অনেক খাটাখাটি করলাম, চাষার মতো মাটি কোপালাম । লক্ষ্মী উল্লাস করে বললেন, হায়দ্রাবাদ-এর বীজ অব্যর্থ , গাছ হবেই হবে । এর পর হাচড়পাঁচড় করতে করতে রোজ জল দিতাম, গাছ ও কিছু হল ।

সেদিন সকালে দরজা খুলে পিছনে যেতেই দেখলাম পাশের বাড়ির পিটার এর ড্রাইভওয়ে তে একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। পিটার সত্তরোর্ধ বিপত্নীক এক আমেরিকান ভদ্রলোক, একাই থাকেন, মাঝে মধ্যে ছেলে বৌ একমাত্র নাতি জশ কে নিয়ে দেখা করতে আসে । জশ এলে দাদুর কাছে থেকে যায় । গাড়ি দেখে বুঝলাম যে জশ এসেছে। মনে মনে ভাবলাম “যাক বুড়োর এই উইকএন্ডটা ভালই কাটবে। জশের সাথে আমারও ভালই আলাপ আছে, দেখা হলেই হাত পা নেড়ে অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা বলে। সব কথা ভাল বুঝিনা কিন্তু প্রাণবন্ত এই ছ’বছরের শিশুকে দেখলেই মনটা ভাল হয়ে যায় ।

সেদিন বাগানে গিয়েই আমার চক্ষুচড়কগাছ, চারা গুলো কেউ যেন মুড়িয়ে খেয়েছে । নির্ঘাত ঐ লক্ষ্মীছাড়া কাঠবেড়ালী গুলো । লক্ষ্মী বারবার বলেছিল একটা বেড়া দিতে, তা আর দেওয়া হয়নি। মাটিতে ধপ করে বসে পড়লাম। মাথায় আগুন ছুটল, প্রতিজ্ঞা করলাম নির্মম হয়ে নির্মূল করব কাঠবেড়ালীর বংশ । হঠাৎ মনে পরে গেল ছোটবেলার কথা । কোন এক শীতে বাবা অনেক শখ করে বাগান করেছিলেন বোকারোর বাড়িতে, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ফ্রেঞ্চ বীন আরো কত কি। মালীও রাখা হয়েছিল। গাছও বেশ গজিয়েছিল । কিন্তু হলে হবে কি , এক ছাগল শিশু সব খেয়ে গিয়েছিল। বাবার সে কি রাগ, দা নিয়ে সারা শহর ছুটেছিলেন , সামনে ছাগলছানা পিছনে দা হতে বাবা তার পিছনে মংগলি ছাগলের পালিত মা। বাবা চিৎকার করছে “কেটেই ফেলবো আজ তোকে” আর মংগলী চিৎকার করছে “বাবু উটাকে মারিসনা, উটা আমার ছেলে আছে বটেক” । মনে মনে হেসে ফেললাম। মাথাটা আপাতত ঠাণ্ডা হল।

সন্ধেবেলা মৌসুমির বাড়িতে গেলাম। মেয়েটি খুব ভাল রান্না করে, বাঙালিদের পার্টি মানেই ভূরিভোজ , ডাল,তরকারি, মাছ, মাংস, চাটনি। এছাড়া নানারকম হাতে করা মিষ্টি তো থাকেই । সুন্দর ফ্রেঞ্চ ওয়াইন এর সঙ্গে সুদেবের গলায় সুন্দর গান, মনটা একদম ফুরফুরে হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরতে রাত বারোটা হয়ে গেল।

হঠাৎ মাঝরাতে খসখস শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল উপরের ঘরে কেউ ছোটাছুটি করছে, ভাবলাম কি আর হবে আটিকে নিশ্চয়ই chipmunk ঢুকেছে। একটু পরে ঝিমুনি আসতেই মনে হল শোবার ঘরের দরজার বাইরে কারুর পায়ের আওয়াজ। ভাগ্যিস ঘরের দরজা বন্ধ রাখি। নিজের মনেই বিড়বিড় করলাম "বেশি ওয়াইন খাওয়া হয়ে গেছে মনে হচ্ছে"। পুনরায় বালিশ জড়িয়ে ঘুমোবার তোড়জোড় করলাম। আবার শুনতে পেলাম, মিহি গলায়ে কে যেন ডাকছে "মিসেস -মু –খা ---র্জি, মিসেস ---মু –খা ---র্জি" । সর্বনাশ, আমেরিকাতেও ভূতের উপদ্রব ? তাও ভূত আবার আমার নাম জানে? হাত পা ঠাণ্ডা হবার যোগাড় হল। পাশে কর্তা কুম্ভকর্ণের মতো নাক ডাকাচ্ছে, ঠেলে দিতেই তিনি বালিশটাকে চেপে ধরে "মাধুরী মাধুরী" বলে পাশ ফিরলেন। শুনে গা জ্বলে গেল। নির্ঘাত ঐ সিনেমার মাধুরী দীক্ষিত। বুড়ো বয়েসে কর্তার কি ভীমরতি গা? এই তো সেদিন বললেন "একটু মাধুরী দীক্ষিতের মতো হাসতে পারো তো?" আমিও কোমর দুলিয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠেছিলাম, আমি যদি মাধুরী দীক্ষিতের হাসি দিই সবসময় তাহলে রুই মাছের মাথা দিয়ে পুঁইশাক মিষ্টিকুমড়োর চচ্চড়ি, কচু দিয়ে চিংড়িমাছ এসব রান্নাগুলো কে করবে শুনি? আর ঐ নিটোল ভুঁড়িটা ফুটবল হবে কি করে দিন দিন"? যাক এসবের বিহিত করতে হবে পরে, এখন তো ভূত তাড়াই। কি করি কি করি ভেবে একটা রামচিমটি কাটলাম কর্তার গায়ে। এইবার দাওয়ায় কাজ হল। কর্তা তড়াক করে উঠে বললেন "বিরক্ত করছো কেন"? আমি ফিসফিস করে বললাম "চুপ, মনে হচ্ছে দরজার বাইরে কেউ আছে, ঐ শোনো"। সেই আওয়াজ আবার শুনলাম , কেউ মিহি গলায় বলে যাচ্ছে মিসেস ---মু –খা ---র্জি, মিসেস ---মু –খা ---র্জি। কর্তার সাংঘাতিক ভূতের ভয়। কর্তা গোঙানির সঙ্গে বললেন "এতো মনে হচ্ছে নিশির ডাক"। বিভ্রান্ত হয়ে ভাবলাম পুলিশকেই ডাকি , কল করলাম 911। ছোট্ট থানার অফিসার ফোন তুলে বললেন, "চুরি ডাকাতি হলে যেতে পারবোনা, খুন হলে বলবেন"। আমি চিৎকার করে বললাম, খুন হব হব করছে, যে কোন মুহূর্তে ভূত এসে ঘাড় মটকাবে আমার"।

অফিসার বললেন "ইউ মিন এ ব্রেক-ইন "?

"অত শত জানিনা, গলার আওয়াজ শুনছি কিন্তু কাউকে দেখতে পাচ্ছিনা" ।

"ঠিক আছে ডেস্প্যাচ পাঠাচ্ছি, দরজা খোলা রাখো । যদি এটা ওভার ড্রিংকিং এর সমস্যা হয় তাহলে অনেক জরিমানা লাগবে" ।

কর্তা চিৎকার করে বললেন "পারবোনা দরজা খুলতে এখন" ।

এদিকে আওয়াজটা দরজা থেকে সরে রান্নাঘরের দিকে গেল। মনে হল কেউ ফ্রিজ খুলছে, তারপর শোনা গেল থালবাসনের ঝনঝন আওয়াজ। কর্তা করুন মুখে বললেন, “এ নির্ঘাত বাঙালি ভূত, মাছের ঝোল খেয়ে নিচ্ছে” ।

একটু পরেই পুলিশের গাড়ির সাইরেনের আওয়াজ শুনতে পেলাম। তারপর চিৎকার, চেঁচামিচি, মনে হল বাড়িতে আলো জ্বলে উঠল। তারপর শোবার ঘরের দরজাতে দুমদুম ধাক্কা, “ইউ আর সেফ, বেরিয়ে এস। কোনোরকমে আলুথালু অবস্থায় বেরিয়ে এসে রান্নাঘরের দিকে গেলাম। হতভম্ব হয়ে দেখি কিচেনের আইল্যান্ড এ জশ বসে, পা দুলিয়ে দুলিয়ে আইসক্রিম খাচ্ছে, পাশে দুই পুলিশ অফিসার। জিজ্ঞাসাবাদ করতেই জানা গেল, দাদু বকেছিল, তাই পালিয়ে এসে আমার বাড়ির গ্যারেজের দরজা দিয়ে ঢুকে আটিকে বসেছিল, রাত্তিরে খিদে পাওয়াতে সে নেমে এসেছে খাবারের সন্ধানে। পিট কে খবর দিতেই সে হন্তদন্ত হয়ে এসে উপস্থিত । নাতিকে দেখে আনন্দে কেঁদে ফেললেন । সারাদিন নাতিকে খুঁজে না পেয়ে তিনিও পুলিশকে খবর দিয়েছিলেন।

যাবার আগে জশ মাথা নিচু করে বলল “সরি মিসেস মুখার্জী” ।

ফাঁড়া কাটলো। পরের দিন ভোর হতেই, গাড়ি নিয়ে বেরুব কাজে। দেখলাম জশের মা তাকে ঠেলে গাড়িতে ঢোকাচ্ছে। জশ ছুটে এসে বলল “ আই লাইক ইওর আইসক্রিম, মিসেস মুখার্জী, ক্যান আই হ্যাভ দিজ ফর এ ক্রিস্টমাস গিফট” ?

সুশোভিতা মুখার্জি ওহাইও স্টেটের মমি শহরের বাসিন্দা ।

অ্যান আর্বার মিশিগানে রিসার্চ সায়ানটিস্টের কাজে ব্যস্ত থাকেন ।

মাঝে মাঝে অবসর পেলে নিজের জীবনের ঘটনাবলি থেকে কোনও কোনও মজার অভিজ্ঞতা পাঠককে আনন্দ দেবার উদ্যেশে লিপিবদ্ধ করেন ।

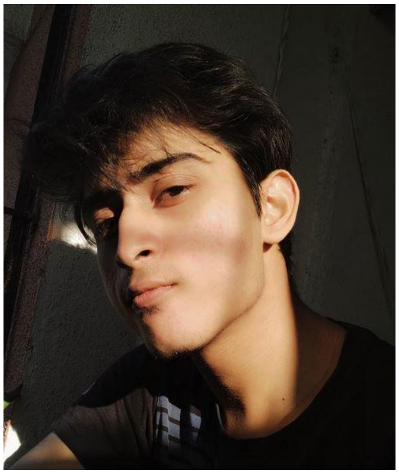

Abhishek Datta: Age: 20

I'm a Computer Science Engineering student,

with a real love and passion for drawing.

I draw anyone or anything that I find inspiring!

I love listening to pop music, and my favourite time of the year is Durga Puja

Swapnila Das

Swapnila is a mother of two daughters and lives in Manlius. She has a background in interior designing. Besides painting, her hobbies include gardening, traveling, and cooking.

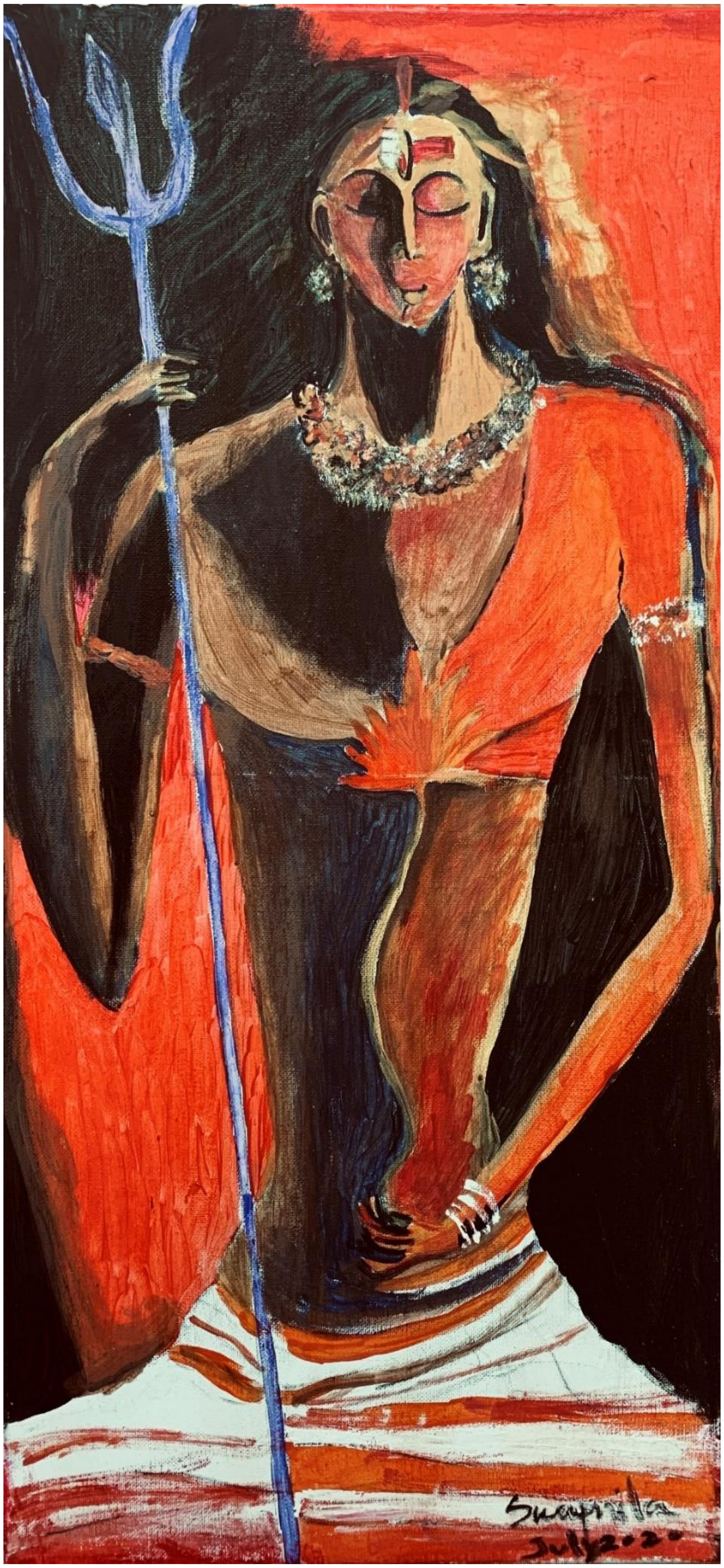

Dipa Dasgupta lives with her husband Arnab and son Arpan in New Hartford, New York.

Dipa loves to make portraits & landscapes using watercolor, oil paint and acrylics since her childhood.

While working in Central Excise and Customs (CES) back in India, Dipa was awarded 2nd in an art competition held nationwide among the CES employees.

Dipa Dasgupta

অঙ্কন

অমৃতা ব্যানার্জি

কোলকাতা নিবাসী অমৃতা ব্যানার্জি জল ও তেল রঙের মাধ্যমে ছবি আঁকেন ।

প্রদীপ্তা চ্যাটার্জি অনেক বছর ধরে নিউ ইয়র্ক স্টেটের ভেস্টাল নমের একটি ছোট শহরের বাসিন্দা । অফিস অভ মেন্টাল হেল্থে কর্মরত এবং অবসর সময়ে সামান্য লেখালেখির চেষ্টা করেন ।এই ছবিটি compuerter এর MS Paint Program দিয়ে এঁকেছেন এবং রঙ করেছেন ।

My Oracle

Asish Mukherjee

You came to me when twilight fell
And crickets hummed in the darkening dale
And the limpid moon shone silver pale
On Memory's dark and winding trail

You told me life is a strange tale
Driven by Time's blowing gale
That sweeps our gems into Yesterday's well
And shrouds them in dark Oblivion's veil

You told me my journey has now begun
For my soul to reach the eternal Sun
And gain the vision to see my story
Where all my treasures are alive in glory.

You told me you always walked by my side
Along my life's rugged ride
The loves that seemed hidden in rust
Will gleam now with your pixie dust

What's fulfillment? Can you reveal?
Are hopes ever meant to turn real?
You said each moment is real like a gem
Carved from Time's moving game

Splintered hopes shine just as bright
As cherished dreams with lofty height.
Trampled flowers smell just as sweet
As bouquets offered at the idol's feet.

Asish is a physician by profession; he loves writing, computers, and travel.

Pathivrathaa

Sushma Vijayakrishna

There she goes, Meghana, look, she is one the I was talking about!", Deepa struck my shoulder with a 'kilo' force in excitement.

"Aaah! What about it now? We just have two hours for our exam, and you seem to be least bothered about it. Can we hold the curiosity for later?"

"No Meghana, this is really important. You are not paying attention. I will prove to you, that my 'digging in' is not baseless. We study journalism, and curiosity is part of this profession. Lack of it is not only a shortfall, but also potentially unprofessional! What is the point in studying for and writing exams when we really can't apply the subject?"

"OK I agree, however the need of this hour is to get ready for the exam. Let us look into this matter tomorrow, please? By the way, a journalist cannot afford to be short tempered. This profession demands a lot of patience in pursuing the truth. Being hasty and aggressive can actually mislead us from the factual truth."

"Meghana, for sake of that very truth, turn your head and look out of the window. *Satyameva Jayate*!", yelled Deepa.

Before I could turn back to my desk, she pulled me out of my chair and led me to the window in our dorm room.

As I was watching the street, it was an interesting sight. Just as she described earlier, a woman holding an umbrella was hastily walking away from the crowds into a small lane, at the end of the street. She was clad in a white Bengali cotton saree with pink cherry blossoms on the entire body of the saree. It looked heavily starched, and neatly ironed. Her dress sense spoke of her simple yet conformed lifestyle. She was graceful in her walk even in that hastiness. I bet she must be pretty too. Well, it did arouse some curiosity to my gray cells as well, however, I felt a sting as I absolutely could not see her face.

"Are you sure she always covers her face with the umbrella?", I asked Deepa.

"Aah! Finally, we are talking! Yes, every single day!", added Deepa.

I said, "that's strange! The climate looks pleasant, and why would anyone need an umbrella on such a day? I started pondering over my quick window study."

"Now you see my point Meghana? This is not the first time I've seen her like this. I ran into her a few times, and my curiosity made me observe her a few days consistently. I saw her at several places, including the vegetable market, the library, and the school. Everywhere and all the time the umbrella covers her face. And

the way she walks away from the crowds also looks obnoxious. I have also observed that unless until it is someone relatively new in town, people do not seem to really bother her or are bothered about her. They don't stare at her like I did!", Deepa said in a confessing tone.

"Maybe she had had a childhood accident that left a scar. Does she have a family? Where does she work?", now it was my turn to churn up some questions.

"How does it sound to create a Web Series which showcase such everyday mysteries around us", Deepa exclaimed.

"Honestly, that's not a bad idea. But shall we just head out for the exam now, madam? How can you be so not bothered about an exam? I usually get so worked up. I have already offered ten coconuts to Ganesa and will go and do aarti if I make it through this exam", I said folding my hands in the air as a gesture.

Deepa started laughing out loud. "Really? Are you serious? The coconut vendor must be so happy to have superstitious people like you around."

I ignored her sarcasm for a moment and moved on to finish up my preparation.

****

"Meghana, wake up! It is about 8:30 in the morning. The results are out for us to go check. Also, I have more masala to add to the day", Deepa was up with some high voltage energy that morning.

"Deepa, can you please pull the curtains closer together? I slept late last night after watching a very interesting telugu movie: 'Naalo Okkadu (English : A Man within Me)', and it showcases a psychological thriller, with the protagonist playing two main roles, one that is played out in his dream, and the other in reality - each representing a different character. The concept sounded so novel, and the actor truly deserves an award for his performance!" I gave out the entire gist of the movie making Deepa more restless.

"OK if you're done with your short story can we just head out to check our results first", Deepa pulled me out of bed and led me to the washroom.

"Yippeee, we made it in distinction- both of us! Congratulations Meghana", squealed Deepa and off we went to the nearest ice cream place to celebrate our results and the way our hard work for the year paid off.

Now I was eager to hear out Deepa about her story that she mentioned that morning.

"Deepa, any new findings on our mystery woman? I'm all ears, I said.

"Meghana, You won't believe me, but when I went to meet the warden to complain about the leaky tap in our bathroom , I saw the woman in the umbrella in her office room. I shamelessly leaned forward to catch a quick glimpse of her face but with no luck. I didn't give up! I followed her all the way to home. I'm sure people in the past have bothered her with this kind of curiosity - now she seemed to be completely ignoring it.

She noticed, that I was following her and she finally turned back to stop me. With utmost honesty and politeness, I finally confronted her.

Deepa: Namaste Madam! If you don't mind I would like to talk to you for a few minutes. Is there a good time?

Woman : Who are you ? What do you need ?

Deepa: I am studying my final year of journalism in this college. I might be putting you in a tight spot by asking to talk to me - but your peculiar behavior has made me very restless lately. I need to know the reason behind it. Can you trust me and share your story?

Woman: I don't believe in the word 'trust', anymore. I was tested by life in a hard way. I don't blame anyone for my state. I should have been more careful. My education probably taught me to be wise, and I did not realize it at an younger age. I don't like to bother anyone by sharing my woes. The world doesn't have time to listen to anyone's sad tales. In fact, there hasn't been a single soul in the recent times that has actually ventured out to talk to me or inquire about my well being. You look young and ambitious. You still have a lot too experience and achieve. My story isn't a very interesting one- so please just let it be.

Deepa: Sorry for insisting. My intention is not to sound confrontational. I have observed that you don't show your face to the world anymore. There must be a very strong reason behind this. I don't think you might have committed a mistake, big enough to permanently tax yourself like this. I really want to know?

I actually held her hand and led her to a nearby bench and sat down next to her, as I waited for her to speak.

The woman paused into a dead silence, and then started to speak with her head still held down, under the umbrella.

Woman: I come from a very wealthy and religious family. My parents educated me well. They married me off to a young man who introduced himself as a distant relative through some common friends. The wedding was a rich celebration with family and friends. As soon as I got married, I moved out of my hometown with my husband to this place. He ran some business of his own. The initial days of my marriage were beautiful, as for any newlywed couple. I still have vivid memories woven around different parts of this town, fondly reminding me of those days.

My husband took real good care of me, making me completely trust him, though he was a complete stranger before we got married. As months passed by, he started looking worried, as his business wasn't running very well- as he described it to me. He started coming home late and sometimes stayed away for a few days. I never asked him about his whereabouts. Slowly, days went into weeks and weeks into months and I hardly got a chance to talk to him through those times. Much later I found out that he had a plan to marry me to acquire my father's wealth, and he abandoned me, once he succeeded in getting it. The town went hush hush over our lives and it is through people, I got to know that he was a married man. He left, never to return again. I don't know whose fault it is, however, I am still reaping the fruits. This is all that happened.

Deepa: Then why do you use the umbrella? And, if you don't mind- why didn't you go back to your parents?

Woman: I have been a very shy and reserved person. I don't want to face the world. I am afraid people may meet a similar fate, if they see my face. That's my belief, though it may sound weird. I can say no more.

Deepa: Thank you for sharing your story. I promise not to ask you any further questions. I realized that though the world has taken a giant leap with technological sophistication, certain cultural norms and societal ethics don't change with time.

You were brutally deceived by your husband. Yet, you decided to maintain your vow (to him). Your education, wealth, and an opportunity to get back home did not present themselves as viable solutions to you. That's pretty sad. You chose to stand behind an invisible boundary. I can't believe that people like you exist even to

this day and no logic can explain this mentality. You are an epitome of patience and faith- the one who respects the nuptial knot more than your own personal freedom and happiness. You are willfully bowing down to cultural norms and societal values that no longer hold you responsible. You are willing to live an anonymous life and prefer to remain a stranger to everyone including your own family! Kudos to the Indian woman, who attaches herself to the sentiment of marriage as no other woman on this globe.

I think the world deserves to know your story. If you permit me, I would like to pen an article about it and name it “Pathivrathaa” and there is little doubt that you are a personification of one”,

Woman: I don't know if I am worthy of that title. I took up a job as a schoolteacher as a distraction. I like spending my time with little kids. Their innocence is fresh and a great blessing. I'm used to this town, and this town is used to me. A newcomer’s curiosity is not a problem anymore. My life stands as a reflection for someone’s selfish motive. That is my torch to the world. Thank you for asking to speak to me. It's been ages since I spoke to someone like this. I wish you all the best in life.

And she walked away more peacefully than ever into her bungalow with the gates closing behind her.

****

Meghana: Oh my God! Is that true? Do such people really exist? What a strange story? I must admit that I like your perception about the whole thing- especially her personality and her decision. And, more than ever, I appreciate your curiosity - which is what led you to find out her story. Congratulations!

Deepa: Thanks. I salute all such “Pathivrathaas” who endure hardship and show us by example that life can still happen!

[Based on a True story]

Sushma Vijayakrishna

I am a teacher by profession and an ardent lover of nature by heart. I strongly believe that our very being is always influenced and improved by observing two important facts of life: Mother Nature and People!

Nagarhole National Park

Archana Susarla

I. The Nagarhole National Park is located between the Kodagu and Mysore District and is the largest tiger reserve and Wayanand Wildlife Sanctuary (nature reserve). It consists of a rich forest cover, waterfalls, valleys, streams, and hills. The forest is covered with tigers, gaur (Indian Bison), found in South and South East Asia, elephants, Indian leopards, and deer (Wikipedia, 2020).

II. Location- The Nagarhole National Park stretches through the Western Ghats toward the Brahmagiri Hills, towards Kerala. The Western Ghats is a mountain range which stretches 1600 kilometers, covering six states: Karnataka, Tamilnadu, Kerala, Goa, Maharastra, and Gujarat. The Brahmagiri Hills is a mountain range located between the Kodagu District in Karnataka and Wayanand District in Kerala (Wikipedia, 2020).

III. History- The name Nagarhole derives from “Naga” meaning “snake” and “hole” referring to streams. The Nagarhole National Park was built in 1955 as a wildlife sanctuary (nature reserve), then became a National Park in 1988, eventually becoming a tiger reserve in 1999 (Wikipedia, 2020).

IV. Flora- There are many flora (plants of a particular region, inhabitant, or geological period) in the Nagarhole National Park. The main trees of flora include the Teak, Rosewood, Sandal wood, and Silver oak. The trees in the dry deciduous forest include the crocodile bark, the lagers troemia, lanceolata, Indian Kino tree, Grewia tilaefolia, rosewood, and axelwood. Other species of trees in the forest include the langerstroemia, microcarpa, kadam cotton tree, Schleichera trijuga, and the ficus (Wikipedia, 2020).

V. Fauna- The Nagarhole National Park consists of fauna (animals of a particular region, habitat, or geological period) and protects Karnatakas wildlife. The predators making up the Nagarhole National Park are both, carnivorous and herbivorous. Carnivorous animals making up the fauna include the Bengal Tiger, the Indian Leopard, dhole, sloth bear, and the striped hyena. The herbivorous animals include the shirttail, sambar deer, barking deer, four horned antelope, gaur, the wild boar, and the Indian elephant. Other mammals living in the fauna are the gray langur, bonnet macaque, slender loris, small Indian civet, and the Asian palm civet. The Nagarhole National Park also includes the Asian brown mongoose, striped neck mongoose, European otter, Indian flying giant squirrel, Indian giant squirrel, porcupine, golden jackal, chevrotain, hare, and the Indian pangolin (Wikipedia, 2020).

VI. Birds- Birds are a particularly important part of the Nagarhole National Park. Many endangered birds including the oriental black vulture, the lesser adjutant, the greater spotted eagle, and the nilgiri wood pigeon live in this park. Near endangered species that occupy the Nagarhole National Park include darters, the oriental white ibis, the greater grey headed fish eagle, and the red-headed vulture. The Nagarhole National Park is home to the blue-winged parakeet, the Malabar grey hornbill, and the white bellied teepee.

The painted bush quail, silkeer malkoha, the ashy prinia, Indian robin, the Indian peafowl, and the yellow legged green pigeon are consistently found in more drier climates (Wikipedia, 2020).

VII. Reptiles- Many reptiles inhabit the Nagarhole National Park. The mugger, common vine snake, common wolf snake, rat snake, the bamboo pit viper, Russell's viper, the common krait, the Indian rock python, the Indian monitor lizard, and the common load all inhabit the park (Wikipedia, 2020).

VIII. Insects- The Nagarhole National Park consists of forty-seven seasonal and four perennial lakes, tanks, and swamps, in addition to both, warm and cold-blooded animals.

Reference

Nagarhole National Park (2020). https://wikipedia.org/wiki/Nagarhole_National _
Park. Retrieved 15 July 2020.

Archana Susarla lives in Vestal, New York. She is a graduate of SUNY Oneonta with a BS in Psychology. She works with Alzheimer's patients engaging them with social activity and memory stimulation.

Silver Lining in Pandemic: A Photo Diary

Vaswati Biswas

When COVID 19 disrupted our normalcy in spring, everything familiar became unfamiliar and closure was the commanding word. Everything paused and we faced a silent spring. One that none of us has seen before.

This claustrophobic world on pause was making me anxious. The only connection to the outer world was my spring walks around my neighborhood and hiking around the finger lakes trails. It was therapeutic! My inquisitive mind started to appreciate the bountiful nature that was blooming in full swing unaware of the disaster in the world. Wildflowers along the roadside, meadows and marshlands created an incredible palette of colors, textures and foliage which went unnoticed in the past. This was a silver lining in pandemic, and I started to capture and study about them. I am sharing few of the captures from my collection.

I observed, yellow, purple, violet and white were the common colors of occurrence in wildflowers around here. Most of them grew abundantly in fields and roadsides, meadows, and marshlands and around the finger lakes.

As we are staying at home in these strange and difficult times, people are discovering the beauty on their doorsteps and finding much solace in the nature. Hiking on these quiet trails and lanes, the vibrant wildflowers, uplifted my wearied soul and taught me to be appreciative of nature and be resilient & strong like them. The earth is healing, sublimely indifferent to human anxieties.

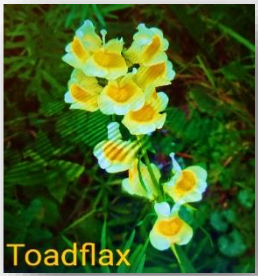

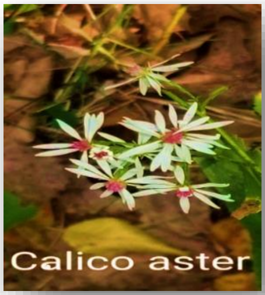

Vaswati Biswas is longtime resident of upstate New York. She loves reading, writing, and nature

Vaswati Biswas

Sweet Revolution

-Sambit Saha

Sweet is the rustle of leaves,

In this morning hour.

Feel the force of bracing wind,

As a tempest rains the ear.

‘Tis the fury of percussion rhythms,

Drum beats, loud and clear.

A change is coming to our shore,

Coming through the door,

And the gale has blown away the fear.

The virtuous land has spoken,

With a burst of righteous color.

Twigs and branches strew the grass,

Like fallen soldiers of war.

No joy could be fuller on this day,

No victory holier on air and clay,

O kind, protector, goddess mother!

,

Sambit Saha lives in Vestal, New York with his wife, Anju. He enjoys science, history, literature, nature, blogging, volunteer work and activism in education, environmental and livelihood projects. He has a doctoral degree in Engineering from Lehigh University and works in an aerospace company.

Mourn not the fall of autumn leaves,

For it was bound to be.

Fear not the dreary winter or white snow,

For time will oversee.

But cheer the chance to build anew,

When spring calls the new and free.

Leave the windows open,

And let the north wind blow.

Gather the fire of kindred spirits,

And let the warmth overflow.

Rebuild the world, yet once again;

More just than ever before!

HOORAY

শুভ নববর্ষ
EXIT

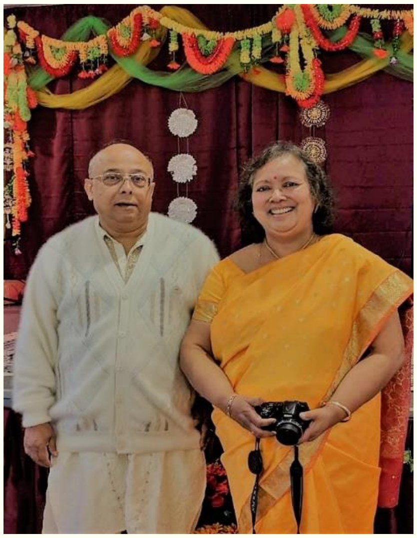

Greater
Binghamton
Bengali
Community